শৈলকণ্ঠ।



শ্রীকৃষ্ণকালী গুহ প্রণীত।

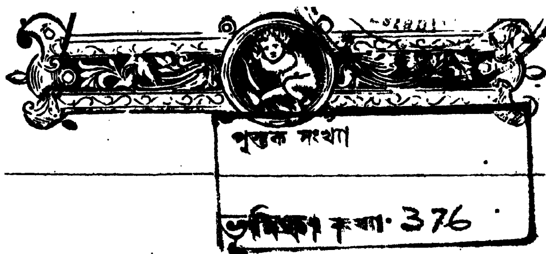


১৩০৮

কলিকাতা।
৭৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, "নিউব্রিটানিয়া" যন্ত্রে
শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য।

আর্ট পেপারে ছাপা, ফুলমরক্কো বাঁধা, সোণার জলে নাম লেখা—৪৲
ঐ ঐ ঐ রেশমে ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ—১॥০
ঐ ঐ ঐ কাপড়ে ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ১৲
আইভরি ফিনিশ, পেপারে ছাপা, কাপড়ে বাঁধা, সোণার জলে নাম লেখা ৷৶০
ঐ ঐ ঐ ঐ কাগজের মলাট ... ... ॥৴৹



ভূমিকা

যে গ্রন্থই লিখ না কেন, তাহার একটা ভূমিকা চাই। ইহা ছিল সে কালের কথা। আজ কাল তাহা বড় আবশ্যক করে না। অধুনা সাহিত্যজগতে যেরূপ বাঙ্গলা গল্প-উপন্যাস-নাটিকায় ছড়াছড়ি হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে জানিয়া শুনিয়া এ চেষ্টা কেন? তাহার উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমরা যশের প্রার্থী নহি। এক্ষণে উপন্যাস লিখিয়া "বঙ্কিমচন্দ্র" না হইতে পারিলে কেহ আর তাঁহার "উজ্জ্বল—মধুর" দেখিতে পান না; আর কড়ি মধ্যমে (সুর ধরিয়া) "নাচিতে" "নাচাইতে" "হেলিতে" "ছুলিতে" সুর ধরিয়া কেহ মাতাইতে না পারিলে যশস্বী হইতেও পারেন না। আমরা সমান্য উপকরণে সরল ভাষায় এই ক্ষুদ্র উপন্যাস শেষ করিলাম।

আমার প্রধান সুহৃদ্ আগরা ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব লেজার-কিপার
এবং "নির্ব্বাপিত-দীপ" প্রণেতা ৩৮ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট নিবাসী
বাবু অমৃতলাল নিয়োগি। যিনি "শৈলকণ্ঠ" পড়িয়া কত আনন্দ
প্রকাশ করিয়াছিলেন, যিনি পুস্তক প্রকাশের জন্য সর্ব্বদা আমাকে
বলিতেন, সেই বন্ধুপ্রবর গত ১৩০৫ সনের ১লা চৈত্র অকালে
কালগ্রাসে পতিত হইয়া আমাদিগকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া
গিয়াছেন। এই "শৈলকণ্ঠ" পূর্ব্বে প্রকাশ হইলে তাঁহার কত
আনন্দ হইত।

পরিশেষে "শ্মশান" প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমবিহারী
দাস মহাশয় নিস্বার্থ ভাবে এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনাদি কার্য্যের সমস্ত
ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহারই জন্য এই কার্য্য শেষ হইল।
ইতি

কেজুড়ি—টাঙ্গাইল,
৫ ই শ্রাবণ ১৩০৮।

শ্রীকৃষ্ণকালী গুহ



শৈলকণ্ঠ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মনোরমা।



ষ্মের প্রখর তাপে কোন এক পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী মাতা সূর্য্যাস্তের পর করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া প্রাসাদোপরি উপবেশন করতঃ, অনন্যমনে ম্লানমুখে পুত্রের ভাবনা ভাবিতেছেন। কখন বা শোকাবেগ বৃদ্ধি হওয়ায় দরবিগলিত-ধারে চক্ষু হইতে বারিধারা বাহির হইয়া গণ্ডদেশ বহিয়া পড়িতেছে। চন্দ্রকিরণে উহা মুক্তামালার ন্যায় দেখাইয়া হিমমুকুলের মত প্রাসাদোপরি পতিত হইতেছে। আবার তিনি কখনও বা

শোকবিহ্বলার ন্যায় মূর্চ্ছিতা হইয়া প্রাসাদের ছাদের উপর পতিতা হইতেছেন। মুখে বাক্য নাই,—স্পন্দহীন,—কেবল এক একবার বলিয়া উঠিতেছেন :—"বাছা আমার কোথায় কি ভাবে আছে, আমি হতভাগিনী মাতা জীবিতা থাকিতেও তাহার কোন সন্ধান করিতে পারিলাম না।" এমন সময়ে একটী বালিকা আসিয়া বলিল :—"মা! তুই সর্ব্বদা কাঁদিস্ কেন? আমার ক্ষুধা পেয়েছে কিছু খেতে দিবি না? না মা! আমি খাব না! তুই সর্ব্বদা কেন কাঁদিস্ তাহা একবার আমাকে বল্, তার পর খাব।" মাতা চক্ষু মুছিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বালিকার প্রতি চাহিয়া বলিলেন :—"মা মনোরমে! আমি সর্ব্বদা যে কি জন্য কাঁদিতেছি, তাহা তোর নিকটে বলিলে কি হইবে বল্? তুই ছেলেমানুষ,—কিছু বুঝিতে পার্বিনি।"

মাতার এই কথা শুনিয়া মনোরমা আর কিছুই বলিল না, কেবলমাত্র মুখভারি করিয়া তাঁহার ক্রোড়দেশ অধিকার করিল। বালিকার তখনকার সে ভাব দেখিয়া অনুমান হইল, সে যেন মনে মনে বলিতেছে যে :—"তুমি যতই কেন না বল আমি খাবও না, কথাও বলিব না।" মাতা তাহার সেই ভাব অনুমান করিতে পারিয়া বলিলেন :—"আ পাগ্‌লি! তুই কি সে কথা না শুনিলে খাবিই না? আচ্ছা, যদি এতই হইয়া থাকে তবে চল্ নীচে যাই, সেইখানে বসিয়া তোর নিকট সকল কথা বলিব।" মাতা ও কন্যা কথোপকথনের জন্য নিম্নগৃহে প্রবেশ করিলেন। আমরা এই সময়ে এই বালিকা মনোরমার বিষয়ে কিছু বলিয়া রাখি।

মনোরমা বালিকা, যেন প্রভাত কিরণে স্ফুটনোন্মুখ পদ্ম। বাল্য-কাল যে কি সুখের সময়, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না। বাল্যকালের সমুদায় লীলা, আনন্দ, নিশ্চিন্ত ভাব কি কোমল। স্মৃতির অবলম্বনে কালের পশ্চাদ্দেশে আর একবার বিচরণ করিতে কাহার না ইচ্ছা যায়? যে কালের নির্ভাবনায় সকলই সুসময় বোধ হইত, যে কালের সরলতা ও অনভিজ্ঞতানিবন্ধন কিছুতেই কুভাব উপলব্ধি হইত না, সকলই সুন্দর ও উৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান হইত। যাঁহারা বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, বাল্যকাল কি সুখময়, কি মধুময়, কি আনন্দময় ছিল। বোধ হয় তাঁহাদের ইচ্ছাও হয় যে, তাঁহারা আবার বাল্যকাল প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম এমন কঠিন যে, তাহা আর হয় না। বাল্যকালে বাল্যসুখ কি মধুর জিনিষ, তাহা বুঝা যায় না। সেই প্রেমানন্দ ধূলা-খেলা, সেই উলঙ্গ বেশ, সেই কোমল মুখের মধুর হাসি যদি যৌবনে কেহ মনে করিয়া দেয়, মনে বড় কষ্ট হয়। মনোরমা এখনও বালিকা, তাহার এখনও ধূলা-খেলা যায় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া এখন সে গ্রামের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মত মাথায় ধূলা দিয়া খেলা করে না। মনোরমা সুন্দরী, কিন্তু কি প্রকার সুন্দরী, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই আমরা বলিতে নাচার। আমরা কেমন করিয়া সেই সুকোমল বালিকা-মূর্ত্তি কেবল একটী মাত্র হংসপুচ্ছ সাহায্যে চিত্রিত করিয়া দেখাইব? স্থূল কথায় এই মাত্র বলিতে পারি, যদি কোন পাঠক কি পাঠিকা কোন বালিকার রূপে মুগ্ধ হইয়া মনে করিয়া থাকেন যে, ইহার মত সুন্দরী আর

পৃথিবীতে দ্বিতীয়া নাই, তবে সেই রূপ হৃদয় মধ্যে পুনরুদ্দীত করুন। আমাদের মনোরমাও সেইরূপ। ইহা ব্যতীত যে, আমরা তাহার সেই সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল, সেই দেববিনিন্দিত মুখকান্তি, আকর্ণবিস্ফারিত চক্ষুযুগল, রক্তিমাভ অধরৌষ্ঠ, সেই কোমল চেহারা, সেই নিটোল গঠন, সেই বর্ণ, যাহা ভাস্কর চিত্র করিতে অসমর্থ;—যাহা কেবল একমাত্র জগদীশ্বরের তূলিতেই চিত্রিত হইয়া থাকে,—আমরা সেই চিত্র কেমন করিয়া লিখিয়া দেখাইব? মনোরমার বয়স ৮ বৎসর। কিন্তু গঠনমাধুর্য্যে তাহাকে ১১ কি ১২ বৎসর বলিয়া বোধ হইত। দুঃখিনী মাতা ব্যতীত তাহার আর কেহই ছিল না। এক ভ্রাতা আছেন, তিনিও আজ ৪ বৎসর নিরুদ্দেশ। তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। মনোরমার পিতা খুব সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন। তিনি আজ কালের লোক হইলে "মহারাজা, রায়বাহাদুর, A. B. C. D." ইত্যাদি অনেক উপাধি পাইতেন। তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ছিল। কিন্তু তাঁহার পরলোক গমনের অল্পদিন পরেই তাঁহার এক জ্ঞাতি চক্রান্ত করিয়া সেই সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন এবং তাঁহাদিগকে ভদ্রাসন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। শ্রীরামপুরে মনোরমার পিতা একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহারা এক্ষণে অন্যোপায় না দেখিয়া সেই বাড়ীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নিকটে সামান্য যে টাকাকড়ি ছিল, তাহারও অধিকাংশ সেই দুষ্ট বুদ্ধি জ্ঞাতি লুটপাট করিয়া লইয়াছিল। যাহা কিছু সঙ্গে ছিল, তাহা দ্বারাই তাঁহাদের শ্রীরামপুরে সামান্যভাবে দিনাতিপাত

হইতে লাগিল। যখন এই সকল ঘটনা হয়, তখন মনোরমার বয়স ৪ কি ৫ বৎসর। মনোরমার ভ্রাতা যিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তাঁহার নাম অমরেশচন্দ্র। এই সমস্ত ঘটনা সংঘটন কালে অমরেশচন্দ্র কলিকাতায় ছিলেন। কলিকাতায় কোন কুঠিতে তাঁহার পিতা অনেক টাকা আমানত রাখিয়াছিলেন। অমরেশ তাহা জানিতেন, কিন্তু খাতা না পাইলে টাকা লওয়া যায় না জানিতে পারিয়া, খাতার অনুসন্ধানের জন্য গুপ্তভাবে বাটী হইতে পলাইলেন। দুঃখিনী বিধবা পুত্রের জন্য সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন, এবং নানারূপ চিন্তা করিতেন। কিন্তু কোন সংবাদ না পাইয়া দিন দিন আরও হতাশ হইতে লাগিলেন। তাঁহার এমন একটি লোকও ছিল না যে, তাঁহার একটু উপকার করে। ক্রমে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর গত হইল, তথাপি বিধবা পুত্রের কোন সংবাদ পাইলেন না।

এ দিকে মনোরমা ক্রমে বয়োধিকা হইল এবং মাতার বিমর্ষের কারণ বুঝিতে পারিল। পূর্ব্বে মনোরমা কিছু চঞ্চল ছিল, এখন আর তাহার সে চঞ্চলতা নাই। এখন সর্ব্বদা সে মাতার নিকট বসিয়া লেখা পড়া শিখিত, এবং তাহাদের সমস্ত পূর্ব্বকথা শুনিত। মাতা এখন তাহাকে লেখা পড়া শিখাইতে, কি পূর্ব্ব ঘটনা বলিতে কুণ্ঠিতা হইতেন না। সরলা বালিকা মাতার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিত এবং সময়ে সময়ে মাতার গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া মাতাকে সান্ত্বনা করিবার প্রয়াস পাইত।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শৈলকণ্ঠ।



অ

সুরেশচন্দ্র এক্ষণে কোথায়? কি কারণেই বা নিরুদ্দেশ, পাঠক! তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ আমরা পূর্ব্বাধ্যায়েই দিয়াছি। কেনই বা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করেন না? তিনি ত নিকটেই আছেন। বড়লোকের ছেলে হাজারও খারাপ অবস্থাপন্ন হউন না কেন, তথাপি তাঁহার উন্নত হৃদয়ের সংবৃত্তিগুলি কিছুতেই নষ্ট হয় না। যে দিন তিনি শুনিলেন যে, দুর্ম্মতি জ্ঞাতি জাল কাগজ প্রস্তুত করিয়া তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব লইয়াছে, সেই দিনই তাঁহার মনে বিরাগ জন্মিল। আরও যে দিন শুনিলেন যে, তাঁহার মাতা ও ভগ্নীকে ভদ্রাসন বাটী হইতে দুরীভূত করিয়াছে, সেই দিন হইতে তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইল। বাড়ী যাওয়া পরিত্যাগ করিলেন। মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন

না। জ্ঞাতি-শত্রু নিপাতের জন্য মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিলেন। উকীলের বাড়ী গেলেন, কাগজ পত্র উকীলের বাটীতে তৈয়ারী করাইলেন। সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ মোকদ্দমা হারিলেন। উকিল বাবু পরামর্শ দিলেন যে, "আপনি সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা হারিয়াছেন বটে, কিন্তু আপনার পক্ষে বিলাত আপিলের বেশ জোর আছে। আপনি বিলাত আপিল করুন, অবশ্যই আপিলে সুফল পাইবেন।" অমরেশ উকীল বাবুর পরামর্শানুসারে বিলাত আপিলের যোগাড় করিলেন। আপিল করা হইলে মনে মনে স্থির নিশ্চয় করিলেন :—"যদি বিলাত আপিলে মোকদ্দমা হারি তাহা হইলে এ মুখ আর কাহাকেও দেখাইব না। কোন নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া এ দগ্ধ হৃদয়ের অবশিষ্ট অংশ যাপন করিব।" আজ কাল যেমন অল্প সময়েই বিলাতের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয়, পূর্ব্বে তাহা হইত না। এমন কি আপিলের প্রায় ৪ কি ৫ বৎসরের পর সংবাদ আসিত। অমরেশ স্থির করিলেন, যখন এতদিনই মাতা ও ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, তখন আর মোকদ্দমার সুসংবাদ না আসা পর্য্যন্ত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিব না। আজ প্রায় ৭ কি ৮ বৎসর অতীত হইল তিনি বাটী ছাড়িয়াছেন, মাতা ও ভগ্নী কোথায় এবং কি অবস্থায় আছেন, তাহাও অবগত নহেন। দুষ্ট জ্ঞাতি যখন তাঁহাদিগকে ভদ্রাসন হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, তখন তাঁহারা জীবিত আছেন কি না, তাহাও জানিতে পারিলেন না। মনে মনে বলিলেন :— "পরমেশ্বর আমার কপালে যে কত কষ্ট লিখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা

নাই। যদি জ্ঞাতি আমার মাতা ও ভগিনীর মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে, আর যদি পরমেশ্বর আমাকে দিন দেন তাহা হইলে সম্পূর্ণ শাস্তি প্রদান করিবই করিব। কিছু টাকা লইবার জন্য কুঠি-ওয়ালাকে খাতা দেখাইলাম, কত অনুনয় বিনয় করিলাম, কিছু-তেই সে টাকা দিল না। বুঝিয়াছি এও সেই জ্ঞাতির চক্র। আজ রবিবার, ব্যাঙ্কও বন্ধ। যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহা সমস্তই ব্যয় হইয়াছে। আজ আমার নিকট একটিও পয়সা নাই যে, তদ্দ্বারা আহারীয় যোগাড় করি। একরূপ অনাহারেই আছি। ক্ষুধায় শরীর শীর্ণ হইয়াছে। কি করি কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। সূর্য্যদেবও অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। আর চলিতেও পারি না। কোথাও একটা বৃক্ষ দেখিতে পাই না যে, তাহার ছায়ায় বসিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিব। কেমনেই বা এই মাঠ পার হইয়া উকীল বাবুর বাসায় যাইব? যাই—ঐ যে মাঠের দক্ষিণ পার্শ্বে যে কয়টি বৃক্ষ দেখা যাইতেছে, ঐ স্থানে যাইয়া বিশ্রাম করিগে। এখানে বসিয়া থাকিলে আর কি হইবে?" এই বলিয়া অতি ধীরে ধীরে ক্লান্ত কলেবরে সেই বৃক্ষাভিমুখে চলিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ক্ষুৎ-পিপাসায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। "এটী যে বটবৃক্ষ, কেমন সুন্দর বাতাস বহিতেছে, কিছুক্ষণ এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া লই। শরীরে এখন আর এমন শক্তি নাই যে, বিশ্রাম না করিয়া এক পোয়া পথ চলিতে পারি। কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া, এই পুষ্করিণীর জল পান করিয়া, তার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে উকীল বাবুর বাড়ী যাইব।" মনে মনে এই স্থির

করিয়া চাদরখানা বৃক্ষতলে বিস্তার করিয়া শয়ন করিলেন। বৃক্ষের অপর পার্শ্বে আর একটি যুবক বসিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে বলিতে-ছেনঃ—"কোথায় মাতা,—কোথায় বা প্রাণসমা ভগিনী! তাঁহাদের কিছুই আমি জানিলাম না। প্রায় এক বৎসর অতীত হইল তাঁহাদের কোন সংবাদই লইলাম না। আমার মত হতভাগা এ জগতে কে আছে?" অমরেশচন্দ্র তাঁহার এই সব কথা শুনিয়া চম-কিত হইলেন ও মনে মনে ভাবিলেন, "ইহার অবস্থা আর আমার অবস্থা প্রায় একপ্রকার দেখিতেছি। যাই দেখি, লোকটার সহিত একবার আলাপ করিগে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব" অমরেশ-চন্দ্র বৃক্ষের সেই পার্শ্বে যাইয়া দেখিলেন, একটি যুবক হাঁটুতে মাথা সংলগ্ন করিয়া বসিয়া আছেন। মনে মনে স্থির করিলেন, যাঁহার কাতরোক্তি তিনি শুনিতে পাইয়াছেন, তিনি এই হইবেন। এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—"মহাশয়! আপনার নাম কি?" অধোবদনকারী মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, তাহার সম্মুখে একটী সুন্দর যুবক দণ্ডায়মান। যুবকের আকৃতি দেখিয়াই তাহার তাঁহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইল। "মহাশয়! আপনি কি আমার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?"

"হাঁ মহাশয়!"

"আমার নাম শৈলকণ্ঠ। আপনার নাম?"

"অমরেশচন্দ্র।"

"নিবাস?"

"নিবাসের স্থিরতা নাই। আপনার নিবাস?"

"ভবানীপুর"

"কোথায় যাইবেন?"

"ভবানীপুর।"

শৈলকণ্ঠ কিছুকাল মনে মনে কি ভাবিলেন। তাহার পর অমরেশকে বলিলেন :—"মহাশয়! আপনি বলিলেন যে,'আপনার বাসস্থানের নিশ্চয়তা নাই। সে কি কথা? দীন, দুঃখী, ভিখারী যে, তাহারও বাসস্থান আছে।"

অমরেশ বলিলেন :—"যাহার নিজের শরীরের কিছুমাত্র মমতা নাই, আত্মীয় স্বজন বলিয়া একটুও স্নেহ নাই, সুখদুঃখের পরিণাম-জ্ঞান নাই, জীবন যাহার চির অন্ধকারে আবৃত, তাহার আবার বাসস্থানের প্রয়োজন কি? আজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল, আপনি যদি দুই-চারিটি মিষ্টি কথা বলেন তাহা হইলে আপনার সঙ্গেই সঙ্গী হইব। সকলেরই যে বাসস্থান আছে, তাহা নহে।" অমরেশচন্দ্র অতি কষ্টে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

শৈল।—সে সত্য বটে। আপনি এখন কোথায় যাইতেছেন? আপনার আকার-ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, আপনি আমার মত বিপদগ্রস্ত।

অম।—আমি এখন কোন কার্য্যোপলক্ষে ভবানীপুরে যাই-তেছি। আপনি একাকী বসিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আমার যাহা বিবেচনা হইয়াছিল, আপনিও তাহাই বলিতেছেন। আপনিও কি ভবানীপুরে যাইবেন?

শৈল।—আমিও ভবানীপুরে যাইব।

অম।—তবে একটি সঙ্গী পাইলাম, ভালই হইল। এক্ষণে আসুন, দুজনে নিজ নিজ দুঃখকাহিনী বলিয়া স্ব স্ব হৃদয়ের যাতনা লাঘব করি। বেলা শেষ হইলে যাওয়া যাইবে। রৌদ্রের সময় আর চলা যায় না।

শৈল বলিলেন :—"আমারও ইচ্ছা যে, আপনার সহিত কিছুকাল একত্রে বসিয়া আলাপ করি।" হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নিজ জীবনবৃত্তান্ত অমরেশ আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিলেন। বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—"আপনার অবস্থা একবার বলুন।"

শৈলকণ্ঠ বলিলেন :—'আমার অবস্থা আর আপনার অবস্থা প্রায়ই সমান, যে কিছু সামান্য তারতম্য আছে, তাহাই বলি। আপনি বিলাত আপিল করিয়াছেন, আমার মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টেই আছে। আপনি প্রায় ৭ কি ৮ বৎসর বাড়ীছাড়া হইয়াছেন, আমি প্রায় এক বৎসর বাড়ীছাড়া হইয়াছি। আপনার মাতা ও ভগিনী কোথা আছেন, তাহা আপনি জানেন না, আমি আমার মাতা ও ভগিনী কোথায় আছেন, তাহা জানি। এই প্রভেদ।"

অম।—আপনার উকীল বাবুর নাম কি?

শৈল।—ধীরেনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অম।—তিনি আমারও উকীল।

শৈল বলিলেন :—"চল ভাই! এখন যাওয়া যাক্। দিবা অবসানপ্রায়।"

অমরেশ বহুকাল পরে ভাই সম্বোধন শুনিয়া তাহার পূর্ব্বকথা সব মানসপটে উদিত হইল। মনে হইল, যখন মনোরমা

তাহাকে দাদা দাদা বলিয়া, ডাকিয়া হাত ধরিয়া, মাতার নিকট লইয়া যাইয়া, সুমধুর স্বরে মাতাকে ডাকিয়া, তাঁহার নিকট হইতে খাবার লইয়া, তাহার সহিত বসিয়া খাইত,—আহারান্তে কখন দাদা, কখন ভাই, কখন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওষ্ঠ দুখানি কুঞ্চিত করিয়া মধুর স্বরে অমরেশ বলিয়া ডাকিয়া তাহার নিকট নৃত্য করিত, সে সুখ, সে মনোমোহন নৃত্য, সেই আধ আধ স্বরে দাদা, ভাই, অমরেশ সম্বোধন এখন কোথায়? সেই সব পূর্ব্ব স্মৃতি মনে উদিত হওয়ায় তাহার নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল।

শৈলকণ্ঠ অমরেশচন্দ্রের এই ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ— "ভাই অমর! সহসা তোমার এরূপ ভাব হওয়ার কারণ কি?"

অমরেশ বলিলেন ঃ—"ভাই শৈল! তোমার ভ্রাতৃ সম্বোধনে আমার ভগিনীর কথা মনে হইয়া এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য হইয়াছে।"

শৈল মনে মনে বলিলেন ঃ—"ভ্রাতৃস্নেহের কি অসাধারণ ক্ষমতা। এ নশ্বর জগতে সকলই নশ্বর, কিন্তু ভ্রাতৃস্নেহ অনন্ত।" প্রকাশ্যে বলিলেন ঃ—"চল ভাই! এখন যাওয়া যাক্। সন্ধ্যা হইয়া আসিল।"

"তবে চল" বলিয়া উভয়েই প্রস্থান করিলেন।





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

খোস্‌খবর।



উকীল বাবু কোন প্রয়োজন বশতঃ অন্দরে প্রবেশ করিলেন। অমরেশ ও শৈল যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বাটীর সরকার সাবকাশ পাইয়া ভড়র ভড়র করিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন, এমন সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু কোথায় ?"

সচকিত ভাবে মুহুরী উত্তর করিল :—"বাড়ীর ভিতর গিয়াছেন, শীঘ্রই আসিবেন। বসুন।"

উভয়ে পথশ্রান্তে অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন। তাঁহারা নিকটস্থ বিছানায় উপবেশন করিলেন। তথায় "সমাচার-চন্দ্রিকা" একখানা পড়িয়াছিল, অমরেশ সেইখানি লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহার সর্ব্ব প্রথমে যে বিজ্ঞাপনটি দেওয়া আছে, তাহা পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। বিজ্ঞাপন এই :—

"মাতা মৃত্যুশয্যার শায়িতা, ভ্রাতা নিরুদ্দেশ, আমিও অবলা বালিকা। তাঁহার চিকিৎসাদির সাহায্য করে এমন একটিও লোক নাই। বড় বিপদে পড়িয়াছি। যদি ত্বরায় দাদা আসিয়া সাহায্য না করেন তাহা হইলে এ জীবনে মাকে আর দেখিতে পাইবেন না। যদি মাতার মৃত্যুর পূর্ব্বে দাদা না আসেন তাহা হইলে আমার যে কি দশা হইবে, তাহা বলিতে পারি না। আমিও মাতার অনুগামিনী হইব। যদি কোন দয়ালু ব্যক্তি অনুগ্রহ করিয়া আমার দাদাকে অতি সত্বর আমার নিকট আনিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে অবস্থাভেদে পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। আমার দাদার নাম, শ্রীঅমরেশচন্দ্র ঘোষ। বয়স ২৪ কি ২৫ বৎসর। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দেখিতে সুপুরুষ, মুখশ্রী সুন্দর, দক্ষিণ হস্তের তলায় কাল একটি বড় দাগ আছে,—যাহা লোকে জট, জরুল না কি তিল বলে। ইতি তারিখ, ১৭ই শ্রাবণ।

শ্রীমতী মনোরমা দাসী।
২৯ শ্রীরামপুর।
জেলা—হুগলী।

শৈল অমরেশের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন :—"ভাই! তোমাকে আবার বিমর্ষ দেখা যাইতেছে কেন?"

অমরেশচন্দ্র বলিলেন :—"না ভাই! বিমর্ষ হব কেন? উকীল বাবু এখনও যে আস্‌ছেন না? এখনও কি গৃহকার্য্য শেষ হলো না?"

শৈল অমরেশের হস্ত হইতে পত্রিকাখানি লইয়া বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ—"এই বিজ্ঞাপনদাত্রীকে কি তুমি জান ?"

অমরেশচন্দ্র কিছুকাল ভাবিয়া তার পর বলিলেন ঃ—"তাতে প্রয়োজন কি ?"

শৈল।—জিজ্ঞাসা করিতেছি, একে তুমি জান কি না ? ভাব-দর্শনে বোধ হইতেছে, এ তোমার বা কেহ হবে। এ বিজ্ঞাপন তোমা সংক্রান্ত হইবে। তোমার নাম অমরেশ, বিজ্ঞাপনেও এই নাম দেখিতেছি। আচ্ছা তোমার হাতখানা দেখাও দেখি ? তাহা হইলে সব গোল মিটে যাবে।"

এই বলিয়া হস্ত টানিয়া লইয়া হস্তস্থিত অঙ্গুল দেখিয়া বলিলেন ঃ—"তুমিই সেই অমরেশ, ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই।"

অম।—আমিও ভাই ! ঠিক করিতে পারিতেছি না। আমারও ভগ্নীর নাম মনোরমা। যাহা হউক, উকীল বাবু আসিলেই আমি তাঁহাকে মোকদ্দমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীরামপুরে যাইব স্থির করিয়াছি।

শৈলকণ্ঠ হাসিয়া বলিলেন ঃ—"আমাকে সঙ্গে নেবে কি ?"

অম।—এত দূর অনুগ্রহ হবে কি ?

শৈল।—নিলে যাইতে আপত্তি নাই।

অমরেশচন্দ্র বলিলেন ঃ—"ভাই ! তোমার দর্শনাবধি যে আমার মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। প্রথমে তোমার সহিত আপনি

শব্দ ব্যতীত অন্য কিছু বলি নাই। এই এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহা তুমিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে মনে সাহস হইয়াছে যে, ইহাতে তুমি কুপিত হইবে না। তোমাকে আমি সাহস করিয়া আমার সহিত যাইতে বলিতে পারি নাই। তুমি যে নিজ হইতে এই কথা বলিয়াছ, ইহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দি। তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম।

শৈল।—উকীল বাবু আসিয়াছেন।

ধীর। [হাসিতে হাসিতে আসিয়া]—অমর বাবু! পারি-তোষিকের টাকা কই?

অম।—সংবাদ কি?

ধীর। আপনার মোকদ্দমা জিত হইয়াছে। দুই কোর্টের খরচা সমেত পাইবেন। [শৈলের প্রতি]—আপনার নিকটও শীঘ্রই পারিতোষিকের টাকা চাব।

শৈল।—মোকদ্দমার কি রায় দিয়াছে?

ধীর।—রায় আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। কেবল মাত্র বাদী প্রতিবাদীর উকিলের বক্তৃতা হইয়া রহিয়াছে। যেরূপ দেখা গেল, তাহাতে আপনার পক্ষে জয় হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। তবে আপনার অদৃষ্ট। আমি মশাই! জোগাড়-যন্ত্র করিতে ত্রুটি করি নাই এবং অনেক পরিশ্রমও করিয়াছি। এক্ষণে বোধ হই-তেছে যে, পরিশ্রম আমার সার্থক হইবে।

অম।—মোকদ্দমার সংবাদ কি কোন পত্রিকায় বাহির হইয়াছে, না রায় আসিয়াছে?

ধীর।—এই দেখুন "লণ্ডন টাইমস্" পত্রেও বাহির হইয়াছে। আদালতেও রায় আসিয়াছে। তাহাও দেখিয়া আসিয়াছি।

অম।—আজ আমাদের কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে রাত্রেই শ্রীরামপুরে যাইতে হইতেছে। যদি শারীরিক সুস্থ থাকি তাহা হইলে যত শীঘ্র পারি আপনার পারিতোষিকের টাকা আনিয়া দিব। আর পাথেয় স্বরূপ আমাকে উপস্থিত ১০৲ টাকা দিন। ইহাও ঐ সঙ্গে আনিব।

ধীর।—এখন রাত্রি প্রায় ৯টা হইয়াছে। আজ যাওয়া আমি ভাল বিবেচনা করি না। বেশী টাকা একত্রে প্রয়োজন থাকিলেও পাইতে পারেন।

শৈল।—আমিও অমর বাবুর সহিত যাইব প্রতিশ্রুত হইয়াছি, এবং উভয়ে আসিয়া আপনার পুরস্কারের টাকা প্রদান করিব।

উকীল বাবুর নিকট তাঁহারা বিদায় লইয়া আলীপুরের খালের নিকট আসিলেন। শৈল অমরেশকে বলিলেন ঃ—"ভাই! তুমি এখান হইতে একখানা নৌকা ভাড়া কর, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।" অমরেশ নৌকা ভাড়া করিতে গেলেন। শৈল তাড়াতাড়ি একটা ডিস্পেন্সারিতে যাইয়া আবশ্যকমত কিছু ঔষধ কিনিয়া আনিলেন। যখন শৈল ঔষধ লইয়া আসিলেন, তখন অমরেশ একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া উভয়ে শ্রীরামপুরাভিমুখে চলিলেন। শৈল মাঝিকে বলিলেন ঃ—"যদি আমাদিগকে রাত্রি ১১টার সময় শ্রীরামপুরে পৌঁছাইয়া দিতে পার তাহা হইলে বক্‌সিস্ দিব।"

মাঝি বক্‌সিসের লোভে সজোরে নৌকা চালাইতে আরম্ভ করিল। এমন সময় জোয়ার আসিয়া গঙ্গা উজান বহিল। নৌকা দক্ষিণ বাতাসে পালভরে জাহ্নবী-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তালে তালে নাচিতে নাচিতে নক্ষত্রবেগে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে ঘুষুড়ি, বেলুড়, বারাকপুর, বালি উত্তরপাড়া ও কোন্নগর পশ্চাৎ রাখিয়া ১০ ঘটিকার কিছু পরে নৌকা শ্রীরামপুর যাইয়া পৌঁছিল।





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ভিখারিণী।



অমরেশ ও শৈলকণ্ঠ নৌকা হইতে নামিয়া সহরে প্রবেশ করিলেন। মনোরমা ও তাহার মাতা যে কোন বাড়ীতে থাকেন, তাহা তাঁহারা কেহই অবগত নহেন। তাহাতে আবার রাত্রি ভয়ানক অন্ধকার, রাস্তা ঘাট ভাল করিয়া জানা না থাকায় বাড়ী খুঁজিতে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। কাহার নিকট বা জিজ্ঞাসা করিবেন, কেবা বলিয়া দিবে, তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। কেবল অন্ধকারে যে দিকে পথ পাইতেছেন, সেই দিকেই যাইতেছেন। যাইতে যাইতে একটি কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। গৃহে একটি মৃণ্ময় প্রদীপে একটী ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে। দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন, গৃহে অবশ্যই লোক আছে। অমর জিজ্ঞাসা করিলেন :—"ঘরে কে আছ?"

কুটীর হইতে উত্তর হইল ঃ—"ভিখারিণী।"

অমরেশের একটু সাহস হইল। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—"হাগা বাছা! তুমি কি বলিতে পার, এই গ্রামে মনোরমা নামে একটী বালিকা কোন্ বাড়ীতে আছে? তোমরা ত সকল বাটীতে ও সর্ব্বত্র যাতায়াত কর?"

ভিখা।—এত রাত্রিতে সেই বালিকাকে আপনার কি প্রয়োজন?

অম।—শুনিয়াছি মনোরমার মাতা অত্যন্ত পীড়িতা। তাই আমরা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি।

ভিখা।—আপনার নাম কি?

অম।—শ্রীঅমরেশচন্দ্র—

ভিখা।—আহা! আপনার মাতা মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াছেন,—প্রাণ ওষ্ঠাগত। আপনাকে দেখিবার জন্য কেবল জীবিতা আছেন।

অমরেশচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন ঃ—"তবে শীঘ্র দোর খোল।"

ভিখা।—এ বাটী তাঁহাদের নহে।

অম।—কোন্ বাড়ী?

"আসুন, দেখাইতেছি" বলিয়া ভিখারিণী বাহিরে আসিয়া বলিল ঃ—"আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসুন।"

অদৃষ্টের ভীষণ চক্র কে বুঝিতে পারে? সুখের পর দুঃখ, তার পর সুখ, তার পর দুঃখ কে জানিয়া রাখে? এ অনন্ত

সংসারে নিয়ত ইহা বিঘূর্ণিত হইতেছে। জীবনে ইহাই সুখ। যদ্যপি জীবন চিরদুঃখময় হইত, যদ্যপি অনন্ত বিশ্ব মার্ত্তণ্ডতাপে সতত তাপিত হইত, যদ্যপি অন্ধতমসায় পৃথিবী আবৃত হইত, তাহা হইলে সুখসচ্ছন্দতা, স্নিগ্ধকরী বিরামদায়িনী রাত্রি, প্রফুল্ল হাস্যময়ী জ্যোৎস্নাকে কে পাইবার জন্য লালায়িত হইত? সুখী মনে করিতে পারেন, "আমার চিরজীবন এই অবস্থারই অতিবাহিত করিব।" দুঃখীও মনে করিতে পারেন, "আমার চিরকাল এই ভাবেই যাইবে।" অমরেশ এত কাল কত কষ্ট সহ্য, কত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া মনে করিয়াছিলেন, সময়ে একদিন এই সকলই সুখে পরিণত হইবে। কিন্তু সে সুখাশাও এখন স্বপ্নবৎ অলীক এবং মরীচিকার ন্যায় প্রবঞ্চনামূলক বলিয়া তাঁহার নিকট বোধ হইতে লাগিল।

কিছু দূর যাইয়া, অমরেশ ভিখারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন:— "আর কতদূর যাইতে হইবে?"

ভিখারিণী বলিল:—"আসুন, আর অধিক দূর যাইতে হইবে না।"





পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুখ ও দুঃখ।



একটি বৃদ্ধা রুগ্নশয্যায় শায়িতা। দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি যুবক ম্লানমুখে উপবিষ্ট আছেন। বাম পার্শ্বে একটি নবীনা বসিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছেন, ও ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। মাঝে মাঝে পশ্চিম পার্শ্বস্থ যুবককে জিজ্ঞাসা করিয়া শয্যাশায়িনীকে ঔষধ সেবন করাইতেছেন। পশ্চিম পার্শ্বস্থ যুবক আর কেহ নহেন,—আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত শৈলকণ্ঠ। শৈলের পিতা কবিরাজী ব্যবসা করিতেন। তাই শৈল আয়ুর্ব্বেদীয় মতের অনেক ঔষধ জানিতেন, এবং নিজেও M. B. পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার। বৃদ্ধা ডাক্তারি ঔষধ সেবন করিতেন না জানিয়া, শৈল তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদীমতের ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। অবস্থা ক্রমে ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল।

মাতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, অমরেশ নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং পূর্ব্ব পার্শ্বে বসিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। কখন বা শোকাবেগ বৃদ্ধি হওয়ায় পীড়িতা মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন :–"মা! তোমার অঞ্চলের ধন তোমার নিকটে বসিয়া রোদন করিতেছে! মা! একবার কথা বল মা! মা! তুমি রাজরাণী হইয়াও কাঙ্গালিনীর মত হইয়াছিলে, আজ তোমার সেই অতুল সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আর তোমায় কাঙ্গালিনী বলিয়া ঘৃণা করে, এমন লোক কে আছে?"

এই প্রকার বহুবিধ বিলাপ করিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন।

শৈলের আজ সুখের দিন, দুঃখেরও দিন! সুখের দিন কেন? সুখের কথা এখন বলিবার সময় নহে। দুঃখের সময়ে সুখের কথা ভাল লাগে না, এবং আমরাও বলিতে ভালবাসি না। সেই জন্যই এই স্থানে সে সব বলিব না।

শয্যাশায়িনী জানিতেন না যে, আজ তাঁহার বহুকালহারা অঞ্চলের ধন তাঁহারই জন্য রোদন করিতেছে। মনোরমা শৈলের কথামত মাতাকে ঔষধ সেবন করাইলেন। ঔষধ সেবনের কিঞ্চিৎ পরে বৃদ্ধা মৃদুস্বরে বলিলেন :–"মা মনো! একটু জল।"

মনোরমা শৈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন :–"জল দেওয়া উচিত কি?"

শৈল বলিলেন :–"দিলে ক্ষতি নাই।"

মনোরমা শৈলের কথামত মাতাকে একটু জল দিলেন। জল খাইয়া বৃদ্ধা ধীরে ধীরে মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :— "কাহার সহিত কথা বলিলে? ও কে?"

মনোরমা ধীরে ধীরে মাতার কর্ণের নিকট মুখ রাখিয়া বলিল :—"দাদা আসিয়াছেন ও তাঁহার সঙ্গে এই ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন। আমি তাঁহার সহিত কথা কহিতেছি।"

মনোরমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধা বিছানায় উঠিয়া বসিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। উঠিতে না পারিয়া, ক্ষীণ স্বরে ডাকিলেন :—"অমর!"

অমরেশ তাহার নিকট আসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাতা তাঁহাকে রোদন করিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন :— "কাঁদিয়া ফল কি? এখন আমি যাহা বলি, তাহা শুন। এখন যদি তুমি বালকের মত কাঁদ তাহা হইলে আর আমার মনের কথা বলা হইল না। যাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহাও পারিব না।"

অমরেশ চক্ষু মুছিয়া বলিলেন :—"আমি আর কাঁদিব না। যাহা বলিবার আছে বলুন।"

মাতা ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন :—"বাছা! আমার অবস্থা এ প্রকার হইত না। কেবল আজ ৮ বৎসর তোমাকে না দেখিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় আমার অবস্থা এত খারাপ হইয়াছে। তুমি কেন এত দিন আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছিলে?"

অমরেশ সংক্ষেপে সমস্ত কথা তাঁহার নিকট বলিলেন। মাতা তাহা শুনিয়া বলিলেন :—"মোকদ্দমার কি হইয়াছে ?"

অমরেশ বলিলেন :—"ছোট আদালত হইতে বিলাত আপীল পর্য্যন্ত সমস্ত খরচা সহিত আমার পক্ষে জিত হইয়াছে।"

এই কথায় বৃদ্ধার ম্লানমুখ একটু প্রফুল্ল হইল, অধরে একটু হাসি দেখা দিল, যেন—মেঘের আড়াল হইতে সৌদামিনী খেলিল। তিনি একটু মুখ কুঞ্চিত করিলেন। কিছুকাল পরে আবার বলিলেন :—"মনোরমাকে ভুলিও না। আমি বোধ হয় আর বাঁচিব না। উহাকে একটি সৎপাত্রে অর্পণ করিও।"

বৃদ্ধার সেই মুখভঙ্গিতে প্রকাশ পাইল, জ্ঞাতি যেমন তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছিল, তাহার উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে।

শৈলকণ্ঠ অমরেশকে বলিলেন :—"দেখ অমর ! তুমি বুদ্ধিমান। তোমায় অধিক আর কি বলিব ? তুমি যদি এখন বালকের ন্যায় রোদন কর তাহা হইলে সকল দিক নষ্ট হইবে। রোদন পরিত্যাগ কর, একটু সাহসে নির্ভর কর, আর আমি যাহা বলি তাহা শুন।"

অমরেশ হৃদয়-উদ্বেগ গোপন করিয়া অতি ধীরে ধীরে বলিলেন :—"রোদনে যে কোন ফল নাই, তাহা আমি জানি। কিন্তু মন ত মানে না। তুমি যাহা বলিবে বল।"

শৈল বলিলেন :—"আমার বোধ হয় ইঁহাকে বিশেষরূপে শুশ্রূষা করিলে বাঁচিলে বাঁচিতে পারেন। আরও একটি কথা আছে।"

অম।—তুমি যেরূপ করিতে বলিবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। আর একটি কথা কি ?

শৈল।—কথাটি এই, আমার নিকট যে সকল আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ আছে, তাহা পুরাতন বলিয়া ফল দর্শিতেছে না। ডাক্তারী চিকিৎসা করিলে কি ভাল হয় না?

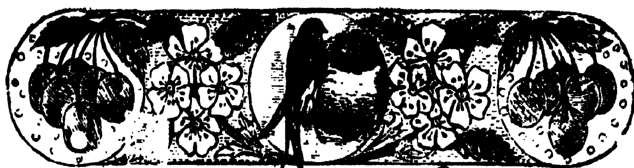
অম।—যদি ডাক্তারীমতে চিকিৎসা করিলে জীবনের আশা থাকে তাহা হইলে তাহা করার কোন দোষ আমি দেখি না। কারণ যদি সুফল ফলে তবেই মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে। তোমার যাহা ভাল বলিয়া বোধ হয়, তাহাই কর। আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।

শৈল।—পীড়া কঠিন,—রজনী প্রভাত না হইলে আমি ঠিক বলিতে পারি না, কতদূর কৃতকার্য্য হইব।

অম।—তবে বৃথা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। ডাক্তারী মতে চিকিৎসা করিতে ক্ষতি কি?

শৈলকণ্ঠ মনোরমাকে একটু পরিষ্কার জল আনিতে বলিলেন। মনোরমা অবিলম্বে জল আনিয়া দিল। শৈলকণ্ঠ ঘণ্টায় ঘণ্টায় নূতন ঔষধ প্রস্তুত করিয়া বৃদ্ধাকে সেবন করাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধা ডাক্তারী ঔষধ সেবনে ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইতে লাগিল,—অবস্থারও উত্তরোত্তর উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। প্রভাতে শৈল বলিলেন:—"এখন আর কোন ভয় নাই।"

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া বাহিরে গেলেন। মনোরমা অমরেশের নিকট শৈলকণ্ঠের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আনন্দ।



খিতে দেখিতে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। মাতা ক্রমে পথ্য পাইলেন। মাতা সুস্থ হইলে অমরেশ একদিন বলিলেন:—"একদিন কলিকাতায় যাইয়া উকীল বাবুকে পারিতোষিক দিয়া আসি। ধীরেন বাবুকে বলিয়া আসিয়াছি, 'অল্পদিন মধ্যে আপনার পারিতোষিক প্রদান করিব।' কিন্তু আজ প্রায় ১৫ দিন হইয়া গেল তবুও তাঁহার নিকট যাইলাম না। তিনি মনে মনে কি বিবেচনা করিবেন? আবার হাইকোর্ট হইতে ডিক্রীও বাহির করিতে হইবে। ডিক্রী জারি না করিলে বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি কিছুই দখল লওয়া যাইতে পারে না।"

মাতা অমরেশের কথায় বলিলেন:—"বাছা অমর! তোমাকে আমি আজ আট বৎসর পর পাইয়াছি। এখনও তোমায় দেখিয়া

আমার নয়ন পরিতৃপ্ত হয় নাই, সাধ মিটে নাই। আর কয়েক দিন পর যাইও। এখনও আমি ভাল করিয়া সুস্থ হই নাই। এ অবস্থায় আমাকে ফেলিয়া কি প্রকারে যাইবে?"

অমরেশ আর কোন কথা বলিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। মাতার অনেক দিনের ইচ্ছা, শৈলকণ্ঠের কথা অমরেশকে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু কখনই অমরেশকে একেলা না পাওয়ায় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই। আজ অমরেশকে একা পাইয়া তাঁহার কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন :—"শৈলের সহিত তোমার আলাপ কত দিন হইয়াছে?"

অম।—শৈলের সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ নহে। মা! যে দিন আমি বাড়ী আসিব, সেইদিন যখন কলিকাতা হইতে ভবানাপুরে যাইতেছিলাম, তখন পথে শৈলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তার পর দুই জনে একত্রে উকীলের বাড়ী গিয়াছিলাম। উকীল-বাড়ী যাইয়া মনোরমা-প্রদত্ত বিজ্ঞাপন পাঠে যখন আমি বাড়ী আসিতে ইচ্ছা করিলাম, তখন শৈলকণ্ঠও আমার সঙ্গে আসিতে চাহিল। আমি তাই সঙ্গে করিয়া আনিলাম।

মাতা।—শৈলকণ্ঠ খুব সৎ ছেলে।

অম।—মা! সে আমার যেরূপ উপকার করিয়াছে, তাহা আমি জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। আমি যখন বাড়ী আসি, তখন আমার নিকট একটিও পয়সা ছিল না। আমি উকীল বাবুর নিকট দশ টাকা ধার করিয়া লইয়াছিলাম। শৈল

নিজের টাকায় নৌকা ভাড়া করিল, আমার সে টাকা রহিয়া গেল। কে বা কখন কেবলমাত্র একদিনের আলাপে এত করিয়া থাকে? তাহারই যত্নে, তাহারই চিকিৎসার গুণে তোমায় ভীষণ মৃত্যু-গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছি।

মাতা।—শৈলকণ্ঠের কে কে আছে?

অম।—মাতা ও একটী ভগিনী।

মাতা।—বাড়ী কোথায়?

অম।—আমার নিকট বলিয়াছে, ভবানীপুর। কিন্তু কোন্ ভবানীপুর, তাহা আমি বলিতে পারি না। বোধ হয়—কলিকাতা ভবানীপুর নয়।

মাতা বলিলেন ঃ—"অমর! তোমাকে আমি যেরূপ ভালবাসি, শৈলকেও আমি সেইরূপ ভালবাসি। তোমাকে যেমন মুহূর্ত্ত না দেখিলে মন কেমন করে, সেইপ্রকার শৈলকেও না দেখিলে মন যেন কেমন কেমন করে। আমার বিবেচনা হয়, শৈলও যেন আমার পুত্র। শৈলের কথাগুলি আমার নিকট বড় মিষ্ট লাগে। শৈল এখন কোথায় গিয়াছে?"

অম।—বোধ হয় বৈঠকখানায় গিয়াছে। আমি যাই, তাহাকে লইয়া আসি।

অমরেশ শৈলকণ্ঠকে আনিবার জন্য বৈঠকখানায় যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে মনে মনে কতই তাঁহার প্রশংসা করিলেন, তাহার অন্ত নাই। মাতা শৈলকে ভালবাসেন, এই কথা মনে হওয়ায় আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। মনের

আনন্দে হাসিতে হাসিতে বৈঠকখানার দরজার নিকট উপস্থিত হইয়া "শৈল" বলিয়া ডাকিলেন। কোন উত্তর পাইলেন না। মনে ভাবিলেন, শৈল ঘুমাইয়াছে। এই ভাবিয়া দরজার নিকট যাইয়া দরজা ঠেলিলেন। দেখিলেন, দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। ভিতর হইতে কপাট বন্ধ দেখিয়া মনে মনে কি ভাবিলেন। ভাবিতে ভাবিতে আবার "শৈল শৈল" বলিয়া ডাকিলেন, আবার দরজায় আঘাত করিলেন। এবারেও কোন উত্তর পাইলেন না। মনে মনে স্থির করিলেন, "শৈল বোধ হয় শ্রান্তি দূর করিবার মানসে কপাট বন্ধ করিয়া নিদ্রিত হইয়াছে। বৃথা এখন আর তাহাকে বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। যাই, মাকে যাইয়া বলি, শৈল কপাট বন্ধ করিয়া নিদ্রিত হইয়াছে; কত ডাকিলাম তবুও উঠিল না।" এই ভাবিয়া যেমন ফিরিতেছেন, অমনই শৈল হাসিতে হাসিতে কপাট খুলিয়া অমরেশকে ডাকিলেন। অমরেশও শৈলের হাসির সহিত যোগ দিয়া বলিলেন :—"তুমি কপাট বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলে কেন? এত ডাকিলাম তবুও উত্তর দিলে না। ডাকিয়া ডাকিয়া উত্তর না পাওয়ায় মনে করিয়াছিলাম, তুমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছ। সেইজন্য ফিরিয়া যাইতেছিলাম। মা তোমাকে ডাকিয়াছেন,—চল।"

উভয়ে হাসিতে হাসিতে অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন। অমরেশ মায়ের নিকট যাইয়া বলিলেন :—"মা! শৈলকণ্ঠ আসিয়াছে।"

মাতা শৈল ও অমরেশকে বসিতে দিয়া মনোরমাকে ডাকিলেন। কিন্তু মনোরমার কোন উত্তর পাইলেন না। সকল ঘর অনুসন্ধান

করিয়া দেখিলেন। কোথাও দেখিতে পাইলেন না। শেষে নিজেই কিছু আহারীয় আনিয়া অমরেশ ও শৈলকে খাইতে দিলেন। তাঁহারা আহার করিতে লাগিলেন। মাতা অমরেশকে বলিলেন ঃ—"যে অবধি তুমি বাড়ী আসিয়াছ, ও আমি একটু সুস্থ হইয়াছি, সেই অবধি মনোরমা আর আমার কাছে সর্ব্বদা থাকে না।"

অমরেশের মাতার কথা শুনিয়া, শৈলকণ্ঠ মাথা নামাইয়া একটু হাসিলেন। তাঁহার সে হাসির একটু তাৎপর্য্য ছিল। তাঁহার সে হাসি কেহ দেখিতে পাইলেন না। সেই জন্য তিনি কেন হাসিলেন, তাহাও কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

মাতা শৈলকণ্ঠকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—"তুমি আমাদের যে উপকার করিয়াছ, তাহা জীবন থাকিতে কখন ভুলিতে পারিব না।"

শৈলকণ্ঠ মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন—খাওয়া বন্ধ হইয়া গেল।

অমরেশ তাঁহাকে বলিলেন ঃ—"শৈল! তোমার বড় লজ্জা! খাওয়া ছেড়ে কি মাথা নামাইয়া থাকিতে হয়? খাও না।"

শৈলকণ্ঠ আবার খাইতে আরম্ভ করিলেন। মাতা আবার বলিতে লাগিলেন ঃ—"বাছা! আমার কাছে আবার লজ্জা কি? তোমাতে ও অমরেশে আমার নিকট প্রভেদ নাই।"

আহারান্তে অমরেশ শৈলকে বলিলেন ঃ- "এখন শীঘ্রই একবার কলিকাতা যাওয়া উচিত।"

শৈল।—আমিও তাহা তোমাকে বলিব বলিব মনে করিয়াছিলাম।

অম।—আমি একটী কথা তোমায় বলিতে চাই, রাখিবে ত?

শৈল।—কি কথা? আমি তোমার কথা না রাখি কবে?

অম।—মা এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নাই, সেইজন্য আমি ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। না গেলেও নয়। এখন গিয়া কুঠী হইতে টাকা লইব, তার পর ব্যাঙ্কের ধার শোধ করিব। আর কত সুদ গণা যায়? দুই লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ব্যাঙ্কে আছে, তাহাও নিতে হইবে।

শৈল।—কি করিতে হইবে?

অম।—মা যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ না হন, ও আমি যে পর্য্যন্ত কলিকাতা হইতে না ফিরিয়া আসি, সে পর্য্যন্ত তোমাকে আমাদের বাড়ী থাকিতে হইবে। তুমি থাকিলে মার ঔষধগুলি নিয়মমত প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবে।

শৈল।—আমারও কলিকাতায় প্রয়োজন আছে, তাহা তুমি জান। উকীল বাবুকে টাকা দিতে হইবে। আর ঈশ্বর না করুন, মোকদ্দমা যদি আমি হারি তাহা হইলে আমার বিলাত আপিল করিব। তাহারও বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

অম।—তোমার কলিকাতায় যে যে কার্য্য করিতে হইবে, সব আমি করিয়া আসিব। সে জন্য তোমায় ভাবিতে হইবে না।

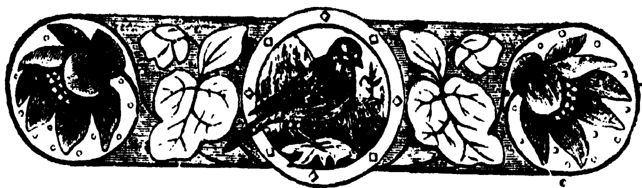
শৈলেরও মনের ইচ্ছা, তিনি শ্রীরামপুরে আর কয়েক দিন থাকিয়া যান। তথাপি মৌখিক আপত্তি দেখাইলেন, এবং যেন

অমরেশের কথায় বাধ্য হইয়া থাকিতে সম্মত হইলেন। শৈল বাড়ী থাকায় সম্মতি প্রকাশ করিলে অমরেশ মাতাকে বলিলেন:— "আমার কলিকাতা যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। যখন শৈলই বাটীতে থাকিতেছে, তখন আপনার শুশ্রূষার কোন প্রকার ত্রুটি হইবে না। আমি আগামী কল্যই কলিকাতা যাওয়ার ইচ্ছা করি। সেখানে যাইয়া আমার নিজের কার্য্যও করিতে হইবে, ও শৈলের কার্য্যও করিতে হইবে। এখন আপনি অনুমতি দিলেই যাইতে পারি।"

মাতা অমরেশের কথায় সম্মতা হইলেন এবং বলিলেন:— "কলিকাতার কার্য্য সারিয়া যত শীঘ্র আসিতে পার, তাহাতে বিলম্ব করিও না।"

মাতার অনুমতি লইয়া পরদিন অমরেশ কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।





সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুইটী ছবি।



নরেশচন্দ্র কলিকাতায় গেলে পর একদিন বৈকালে শৈলকণ্ঠ সন্ধ্যা-সমীরণ-সেবন-মানসে বাহির হইয়াছেন। মনোরমা কি ভাবিতে ভাবিতে বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিশেষ করিয়া কি খুঁজিলেন। খুঁজিয়া খুঁজিয়া, সুন্দর অধরে শরতের নির্ম্মল আকাশের বিজলীর মত একটু মৃদুহাসি হাসিয়া, একখানা কেদারার উপর যাইয়া বসিয়া উচ্চস্বরে বলিলেন :—"বোধ হয় তিনি শীঘ্র আসিবেন না। রোজ রোজই ত এমনি সময় বেড়াইতে যান, আর রাত্রি হইলে আসেন? তবে আজ কেন শীঘ্র আসিবেন?" এই কথা বলার পর টেবিলের উপরিস্থিত সমস্ত বইগুলি একে একে সব খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন; টেবিলে ও পশ্চাতের সেল্‌ফে যতগুলি

পুস্তক ছিল, সমস্তই দেখিলেন। সমস্তগুলিই ইংরেজী নামে অভিহিত। তন্মধ্যে সাহিত্য—দর্শন – বিজ্ঞান—স্মৃতি—ইতিহাস—কাব্য—উপন্যাস—নাটক গ্রন্থের পরিমাণই অধিকাংশ। একে একে সমস্ত পুস্তকের নামগুলি পাঠ করিলেন, কিন্তু কোন খানিতেই মন আকর্ষিত হইল না। অবশেষে মহাকবি সেক্ষপিয়রের গ্রন্থাবলী খুলিয়া তাহার ছবিগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিলেন। কেথারিণের মস্তকের ওড়না দেখিয়া তাঁহার ওড়না পরিতে সাধ হইল। গৃহের চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, অনতিদূরে আলানার উপরে দুইখানা ওড়না সুন্দররূপে কুচান রহিয়াছে। উঠিয়া যাইয়া একখানা ওড়না লইয়া আসিলেন। আসিয়া আবার সেই ছবিখানি একাগ্রচিত্তে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার স্বামী এক দৃষ্টে, অনিমেষ-লোচনে, দীন নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছেন, আর কেথারিণ মুখভঙ্গি করিয়া অন্য দিকে কি দেখিতেছেন। কেথারিণের এ ভাব তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ভাল বিবেচনা হইল না। তিনি অনুমান করিলেন যে, যে ওড়না পরে, তাহার চরিত্রই খারাপ হয়। সে পতিসোহাগিনী হইয়া চিরজীবন সুখে কাটাইতে পারে না। মনে এই ধারণা হওয়ায় মনোরমার আর ওড়না পরা হইল না। ধীরে ধীরে ওড়না খানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। কেথারিণের প্রতি অতিশয় ঘৃণা জন্মিল। উহার ছবি আর দেখিবেন না, এই স্থির করিয়া অন্য ছবি দেখিবার মানসে পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টাইতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার নয়ন পথে পতিপ্রাণা সতী জুলিয়েটের

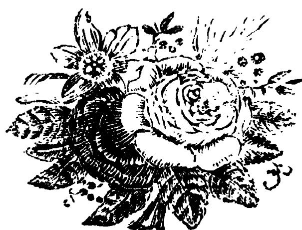
চিত্রপট পতিত হইল। এক মনে. এক দৃষ্টে সেই চিত্রপটখানি দেখিতে দেখিতে আত্মবিহ্বলা হইয়া বলিতে লাগিলেন :—"সখি! যত দেখিলাম, ইহার মধ্যে তুমিই সুখী। যে হৃদয়-বল্লভকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে, সে দুঃখী হইলেও সুখী। তোমার মত সুখী কে আছে? দেখিতেছি, তুমি তোমার হৃদয়বল্লভকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছ। তবে তোমার মুখ ম্লান কেন? সুখের সময় দুঃখের চিহ্ন কেন? প্রদীপ্ত সৌদামিনী-কোলে কাল মেঘ কেন? অমলধবল কান্তিতে কালিমা সঞ্চার কেন? বুঝিয়াছি, প্রাণ শীতল হইলে দগ্ধ প্রাণের জ্বালা প্রথমে অপসারিত হইয়া যায়। তখন মুখের ভাব বিষাদিত, কিন্তু তাহাতে একটু হাসিমাখা থাকে। বিশেষ লক্ষ্য না করিলে তাহা অনুমান করা যায় না।"

এই বলিয়া মনোরমা অন্যমনে পুস্তকখানা বন্ধ করিলেন। কিন্তু সেই মনোমোহন দৃশ্য তাঁহার নয়ন কোণে অঙ্কিত রহিল। মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন, তিনিও একদিন জুলিয়েটের মত তাঁহার হৃদয়বল্লভের হৃদয়ে অমনি করিয়া হৃদয়ে হৃদয় স্পর্শ করাইবেন। তাহার পর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে দুই চারি খানা কাগজ অন্যমনে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। এবার একখানা ভাল কাগজ আনিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কি লিখিলেন, বা কাহাকে লিখিলেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু এবার কাগজখানা নষ্ট না করিয়া টেবিলের উপর যত্নে রাখিয়া দিলেন। তাহার পর সায়াহ্ন-গগনের শোভা দেখিবার মানসে একটী জানালার নিকটে যাইয়া গরাদিয়া ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

জানালার ধার হইতে জাহ্নবীর নীল জলের উপর অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমরশ্মির প্রতিবিম্ব অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। পূর্ব্ব-পারের বৃক্ষ ও অট্টালিকাগুলিতে সূর্য্যের স্তিমিত আলোক পড়িয়াছিল। তাহার প্রতিবিম্ব জলে পড়িয়া নাচিতেছিল। মনোরমার হৃদয়খানিও সেই সঙ্গে নাচিতেছিল।

দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন। পাখীগুলি কোলাহল করিয়া আপনাপন বাসায় চলিল। গাভীগুলি বৎস সঙ্গে করিয়া পুলকে গৃহস্থের গৃহাভিমুখে ধাবিতা হইল। গঙ্গায় ভাঁটা পড়িয়াছে, তজ্জন্য গাধাবোটগুলি নোঙ্গর তুলিয়া ছাড়িয়া দিল। ভাঁটার টানে গজগমনে আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। ক্রমে অন্ধকার হইতে লাগিল। ভিখারিণী প্রদীপ জ্বালিয়া আনিয়া টেবিলে রাখিয়া গেল। মনোরমা আস্তে আস্তে আসিয়া পুনরায় কেদারায় বসিয়া একমনে টেবিলের উপরিস্থিত সেই কাগজখানা দেখিতে লাগিলেন। তাহাতে কত কি লিখিলেন। লিখিতে লিখিতে কতবার হাসিলেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। শৈলকণ্ঠ যে এ ঘরে থাকেন, তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, এ তাঁহার পাঠাগার বই ত নয়। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল। শৈলকণ্ঠ সন্ধ্যা-সমীরণ সেবন করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। মনোরমা লেখায় ব্যস্ত ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। শৈল মনোরমাকে অমরেশচন্দ্র মনে করিয়া বলিলেন:—"কখন এলে ?"

গৃহ মধ্যে শৈলকণ্ঠের গলার আওয়াজ পাইয়া মনোরমা হঠাৎ কেদারা হইতে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন ; কিন্তু পারিলেন না। দেখিলেন, শৈলকণ্ঠ দ্বারে দণ্ডায়মান। আস্তে আস্তে যাইয়া এক কোণে লুকাইলেন। শৈলকণ্ঠ তখন চিনিতে পারিলেন যে, এ অন্য কেহ নহেন, - মনোরমা। তিনি শশব্যস্তে দ্বার ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। মনোরমা সঙ্কুচিত ভাবে অতি সাবধানে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। তাড়াতাড়ির জন্য যে কাগজ খানা এত যত্নে ও পরিশ্রম করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা লইয়া যাইতে ভুলিয়া গেলেন।





অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যুগল চিত্র।



লকণ্ঠ অনিমেষ-লোচনে মনোরমার সেই মৃদুমন্দ গতি দর্শন করিয়া হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ আর চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। যুবক যুবতীর যখন প্রথম প্রণয়ের অঙ্কুর জন্মে, তখন সমস্তই সরলতা ও আনন্দময় হয়, কিন্তু একটু লজ্জা-আবরণে ঢাকা থাকে। মনের সরলতা দৃষ্টিতে প্রকাশ পায়, কিন্তু লজ্জা প্রাণ ভরিয়া তাহা দেখিতে দেয় না। চারি চক্ষুর মিলন? ছি! ছি! লোকে কি বলিবে? দিন যাবে—রবে না। তখন সহস্র চক্ষু একত্রে মিলন হইলেও লোকে ছি ছি বলিবে না।

শৈলকণ্ঠ গৃহে প্রবেশ করিয়া কাপড় ছাড়িয়া জানালার ধারে যাইয়া বসিলেন। দেখিলেন, জাহ্নবী-জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গা-

গুলি আলো জ্বালিয়া সারি বাঁধিয়া বীচিমালার উপর দিয়া গজেন্দ্র গমনে চলিয়া যাইতেছে। একখানি নৌকা হইতে মধুর কণ্ঠে গীতধ্বনি হইতেছে। তাহার পশ্চাৎ একখানা হইতে ঐক্য তানে বাজনা বাজিতেছে। তাহার পর একখানায় ইংরেজী বাজনা। তাহার পর একখানি বজরা। তাহাতে বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারায় সাজান হইয়াছে। তাহার পর ছোট বড় নৌকায় এই প্রকার কত কি। বুঝিতে পারিলেন, "বর" যাইতেছে। এ সব তাঁহার ভাল লাগিল না। যে মোহিনী মূর্ত্তি তিনি হৃদয়-রাজ্যে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহার অনুরূপ দেখিতে পাইলেন না।

একভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া হতাশ মনে চিন্তায় নিমগ্ন থাকায় শৈলকণ্ঠের মনের স্থিরতা দূর হইল। মেঘস্পৃষ্ট বায়ু বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হতাশ মনের চিন্তা বিরত করিতে লাগিল। শীতল-নৈশ-বায়ু-স্পর্শে তাঁহার মনে হইল, অনেকক্ষণ তিনি বাতায়নপথে বসিয়া আছেন। উঠিয়া টেবিলের ধারে যাইয়া পড়িতে বসিলেন। পড়িতে বসিয়া প্রথমেই মনোরমালিখিত সেই কাগজখানির উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। শৈলকণ্ঠ সবিস্ময়ে দেখিলেন, কাগজে একটী যুগল-চিত্র। একটী যুবক, অপরটী যুবতী। একটী অন্যটীকে আলিঙ্গন করিতেছেন। চিত্রটী অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। যুবতী যেন সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিতেছেন,—এখনও বালিকা-ভাব মুখে স্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। দেহলতা এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। চঞ্চল চক্ষুদুটী সরলতা মিশ্রিত হইয়াছে। লজ্জায় আবার তাহা ঈষৎ হেঁট হইয়া

অতি সুন্দর দেখাইতেছে। আর প্রেমালিঙ্গন করিতে যাইয়া সুন্দর ওষ্ঠাধরে যে মধুর হাসি হাসিতেছেন, তাহা যেন অধরে লাগিয়া রহিয়াছে। কোটি চন্দ্র যেন সে মুখের জ্যোতির নিকট পরাভূত হইতেছে। যুবতীর সেই অমিয় ভাব দর্শন করিয়া যুবকের মুখে যে একটী স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইয়াছে, সেটী আরও চমৎকাররূপে চিত্রিত হইয়াছে।

শৈলকণ্ঠ ভাবিলেন, তিনি যেন এই উভয়কেই কোথায় দেখিয়াছেন। শৈলকণ্ঠের চক্ষু চিত্রেই আকৃষ্ট ছিল, তাই এতক্ষণ দেখিতে পান নাই যে, উহার নিম্নভাগে আবার কি লিখিত আছে। সে লেখা পড়িয়া আরও চমৎকৃত হইলেন। লেখা পড়িয়া বলিলেন :—"এ কি স্বপ্ন ?"

নিম্নদেশে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে :—

"শ্রীযুক্ত বাবু শৈলকণ্ঠ রায়।

তাঁহার শত দাসীর একজন

শ্রীমতী মনোরমা দাসী।

হাস রে প্রাণেশ হাস।"

শৈলকণ্ঠ শেষ কথাটী পড়িয়া আর হাসি সংবরণ করিতে পারিলেন না। একাকীই অনেকক্ষণ হাসিলেন। আর অনিমেষ লোচনে সেই চিত্র দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন কি স্বর্গীয় ভাব সম্মুখে উপস্থিত। হৃদয় যদ্যপি এ ভাবে বিভোর না হইল তবে

জীবন ধারণ বৃথা। এতদিনে বুঝিলেন, এ নশ্বর জগৎ প্রেমে বাঁধা। কার প্রেম? প্রেমই প্রেমের প্রেম। জগতে যদ্যপি প্রেম না রহিল তবে মর্ত্ত্যে আর নরকে প্রভেদ কি? হৃদয় বড়ই অস্থির হইল। হৃদয়াবেগে বলিয়া ফেলিলেন:—"কেনই বা বৃথা মরীচিকার আশায় বসিয়া প্রাণ উৎসর্গ করি?"

এমন সময়ে তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল:—"হতাশ হইবার ত কোন কারণ দেখি না।"

শৈলকণ্ঠ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন,—ভিখারিণী।

ভিখারিণী সমস্তই দেখিয়াছিল, সমস্তই শুনিয়াছিল। বলিল:—"দাদা বাবু! লজ্জা পাইলেন কি?"

শৈল।—তুমি এখানে কেন?

ভিখা।—কেন, আমার কি এখানে আসিতে নাই?

শৈল।—না, তা বলিতেছি না ভিখারিণী!

ভিখা।—তবে কি বলিবেন?

শৈল।—তুমি একাকিনী এত রাত্রিতে একজন পরপুরুষের সঙ্গে আসিয়া সচ্ছন্দে কথা বলিতেছ,—তোমার ভয় হয় না?

ভিখারিণী একটু হাসিয়া বলিল:—"আমরা দুঃখী লোক, ভিক্ষা করিয়া খাই, আমাদের আবার পর পুরুষের কাছে যাইতে ভয় কি? বিশেষ আমি আপনাকে দাদা বাবু বলি,—ভাইয়ের কাছে ভগিনীর আবার কিসের ভয়?"

শৈলকণ্ঠ ভিখারিণীর মুখ পানে চাহিয়া চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন:—"গরীবের ঘরে এমন সরলা

বালিকা জন্মে!" প্রকাশ্যে বলিলেন :—"তবে সত্য সত্যই কি তুমি আমার ভগিনী ?"

ভিখারিণী বিষণ্ণ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। দুই বিন্দু জল তাহার গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল।

শৈলকণ্ঠ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন :—"সে কি! তুমি কাঁদিতেছ কেন ?"

ভিখারিণী নয়নাশ্রু বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া ফেলিল। বলিল :—"আপনার কথায়। ভগিনীকে কি ভাই কখন তিরস্কার করে ?"

শৈলকণ্ঠ বলিলেন :—"আমার অন্যায় হইয়াছে।"

ভিখা।—আমায় আর তিরস্কার করিবেন না ?

শৈল।—না।

ভিখা।—তবে আমি আর আপনাকে লজ্জা করিব না ?

শৈল।—না।

ভিখা।—আপনিও আমাকে লজ্জা করিবেন না ?

শৈল।—না।

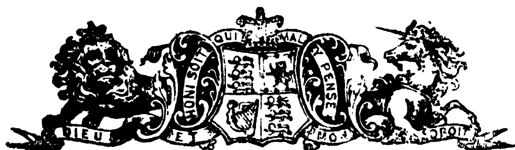
ভিখারিণী পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া আকাশ পানে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। শৈলকণ্ঠও উঠিয়া তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভিখারিণী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল :—"দাদা বাবু! প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, মিথ্যা কথা বলিবেন না।"

শৈলকণ্ঠ হাসিয়া বলিলেন :—"ভগিনীর নিকট মিথ্যা কথা বলিতে নাই।"

ভিখারিণী মুখাবনত করিয়া বলিল :—"আপনি কি মনো-রমার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন ?"

শৈলকণ্ঠ বলিলেন :—"ভগিনী ! তুমি দেখিতেছি সর্ব্বদর্শিনী। তুমি দেবী না মানবী ?"

ভিখারিণী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তাহার পর মুখে অঞ্চল দিয়া হাসিতে হাসিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।





নবম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বরাগ।



মরেশচন্দ্র কলিকাতা যাইয়া সমুদায় কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ দিকে শৈলকণ্ঠ শ্রীরামপুরে থাকিয়া অনেক পরিশ্রমে ও ঔষধ দ্বারায় অমরেশের মাতাকে একেবারে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। মাতা শৈলকণ্ঠকে এত ভালবাসিতে লাগিলেন যে, তাহা বলা যায় না। বোধ হয়, শৈলের মাতাও শৈলকে এত ভালবাসেন না। শৈল তাঁহার এত ভালবাসা দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, আমি কি ইহার গর্ব্ভজাত সন্তান? সন্তানকে লোকে যে প্রকার স্নেহ করিয়া থাকে, ইনিও সেই প্রকার আমাকে স্নেহ করিয়া থাকেন। অমরেশ কলিকাতা যাওয়ার পর আমাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। আমি সকালে বৈকালে বেড়াইতে যাই,

বাড়ী আসিলেই ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করেন, "কোথায় গিয়াছিলে বাবা ?" তাঁহার সেই স্নেহপূর্ণ বাক্যে মনে যে কত আনন্দ হয়, তাহার আর তুলনা নাই। আমার মাতা আছেন, ভগিনী আছে, আমি বাড়ী গেলেও ত তাঁহারা আমাকে দেখিয়া এই প্রকার আনন্দিত হইবেন ? মাতা নিকটে আসিয়া কত কি জিজ্ঞাসা করিবেন,—ভগিনী হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে আসিয়া আধ আধ স্বরে কত আবোল-তাবোল বলিবে। কৈ মনোরমা ত তাহার মত আমার নিকটে আসে না ? আমাকে দেখিলেই লজ্জাবনতমুখী হইয়া ধীরে ধীরে অন্য দিকে চলিয়া যায়। মাতা নিকটে থাকিলে যদিও নিকটে আসে, তথাপি কোন কথা বলে না। জিজ্ঞাসিলে কথা ফোটে ফোটে ফোটে না। মাতা কোন কায করিতে বলিলে ধীরে ধীরে সম্পাদন করে। তাহার সেই ভাব দেখিয়া মনে হয়, সে যেন কথা বলিতে আসে, কিন্তু ব্রীড়া আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরে। আমি কতদিন অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহার কথা শুনিয়াছি। অমন অমৃতমাখা স্বর আর যেন আমার কর্ণকুহরে কখনও প্রবেশ করে নাই। আমার কর্ণকুহরে সেই অমৃতস্রোত প্রবাহিত হইয়া প্রাণকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছে।

পুরুষে যাহা করে, যাহা ভাবে, তাহা প্রায় যৌবনাবস্থায় সকলের নিকট প্রকাশ করে,—কিছুই গোপন রাখে না। বিশেষ বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট বলিয়া থাকে, কিন্তু শৈলের মনোভাব কাহারও নিকট বলিবার নাই। তাঁহার এমন কেহ নাই যে, তাহার নিকট মনের কথা বলেন। মনের কথা অন্যের নিকট না বলিলে

মন সুস্থ হয় না, বরং উহা অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করে। কেবল সকল আশাগুলি একত্র হইয়া হৃদয় অশান্তিময় করিয়া দেয়। শৈলও যাহা ভাবেন, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না,—কেবল হৃদয়ের জ্বালায় দগ্ধ হন। কখন ভাবেন যে, অমরেশ কলিকাতা হইতে আসিলেই তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিব। আবার সেই ভাবনাতরঙ্গে থাকিতে থাকিতেই সে আশার নির্ম্মূল করেন। ভাবেন, কেমন করিয়া এ কথা অমরেশকে বলিব? সে শুনিলেই বা কি বলিবে? এই অল্পদিন আলাপে আমাকে যে সমস্ত বিশ্বাস করিয়া সমর্পণ করিয়া গিয়াছে, আমার কি উচিত এইরূপ বিশ্বাস ভগ্ন করা? কিন্তু কি করিব? আমার একান্ত বাসনা, কোন দিক নষ্ট না হয়। কিন্তু কি জানি কি আকর্ষণী প্রভাবে আমার মন-হস্তীকে বন্ধন করিয়াছে। অতি সূক্ষ্ম, অতি কোমল, অতি ভাবপূর্ণ বলিয়ান মনকে এত বুঝাই, কিন্তু অবোধ মন কিছুতেই বোঝে না।

যাহার অন্তরে ভয়, সে কিছুই করিতে পারে না। যাহার অন্তরে ভয় নাই, সে কোন কার্য্য করিতে একটুও ভাবে না। যখন মন যাহা করিতে বলে তখনই তাহা সম্পন্ন করিয়া ফেলে। সৎ লোকের অন্তরেই ভয় হয়। অসতের অন্তরে ভয় নাই। সৎলোকে যাহা করিতে ইচ্ছা করে, পূর্ব্বে তাহার বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া লয়, পরিণামে কি দাঁড়াইবে। অসতের মনে যদি সে ভাবনা থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীর অবস্থা এমত হইত না। সকল জাতির মনোভাব একপ্রকার হইলে কখনই কোন জাতি বা সম্প্রদায়কে হীনাবস্থায় পতিত হইতে হইত না। দেশের এত

ত্বরাবস্থা হইত না, অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইত না, একজন বিপদে পড়িলে অপরে অকাতরে তাহার সাহায্য করিত। এ কথায় অনেকে বলিতে পারেন, "তবে কি এখন একের বিপদে অন্যের সাহায্য কেহ করেন না ?" আমরা বলিব, "অতি বিরল। যদিও করেন তাহা স্বার্থপরতার জন্য, একতা ধর্ম্মে নহে।" কায নাই আমাদের একতা ধর্ম্মে,—দাসত্বই আমাদের শিরোভূষণ,—তাহাই মস্তকে লইয়া অহঙ্কারে কথা বলি। একতা ধর্ম্ম বলিয়া কি করিব ? কয়জন লোক ইহার আলোচনা করিবেন ? হয় ত অনেকে বলিবেন,—"এ পাগলের কথা মাত্র,—এতে কোন ফল নাই।

"কস্য পিতা কস্য মাতা কস্য ভ্রাতা সহোদরা।
কায়া-প্রাণে ন সম্বন্ধ কা কস্য পরিবেদনা ॥"

পুরুষের যেমন চিন্তাশক্তি আছে, স্ত্রীলোকের কি তাহা নাই ? অবশ্য আছে। তাহারাও ভাবিতে জানে। পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের ধৈর্য্য অনেক অধিক। পুরুষ যাহা ভাবে, ভাল হউক, মন্দ হউক, সকলের নিকট প্রকাশ করে। স্ত্রীলোক তাহা করে না,—হৃদয়ের নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখে। আবার কখনও সেই সব ভাবিয়া ভাবিয়া নিজে নিজেই ক্রন্দন করে। আবার সেই অশ্রুজল মুছিয়া ফেলে,—পাছে কেহ দেখিতে পায়। অশ্রুজলই তাহাদের হৃদয়-উদ্বেগ শান্ত করিবার একমাত্র ঔষধী। তাহাদের মনে যতই কেন কষ্ট হউক না, প্রাণ খুলিয়া একবার কাঁদিতে পারিলেই সকল শান্তি অনুভব করে।

পনের দিন পরে অমরেশ কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই প্রথমে মাতার নিকটে শৈলের সঙ্গে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মাতা অমরেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন:— "কলিকাতায় সমুদায় কার্য্য কি নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছ?"

অমরেশ বলিলেন:—"কলিকাতার কার্য্য শেষ হইয়াছে। আর যাইতে হইবে না। ডিক্রীর নকল পাইয়াছি, জারির সংবাদ আসিয়াছে, আর শ্রীরামপুরে থাকিবার প্রয়োজন নাই। শীঘ্রই চুঁচুড়ার বাড়ী যাওয়ার আয়োজন করিতে প্রস্তুত হই।"

মাতা।—দুষ্ট জ্ঞাতি ত আর গোল করিবে না?

অম।—তাহার আর গোল করিবার সাধ্য কি আছে?

তাহার পর শৈলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন:—"শৈল! নিজের কথায় ব্যস্ত থাকায় তোমার কথা এ পর্য্যন্ত কিছুই বলিতে পারি নাই। ধীরেন বাবু বলিলেন:—'তোমার মোকদ্দমায় জিত হইয়াছে।'"

শৈল মোকদ্দমা জিতিয়াছেন শুনিয়া মনে মনে খুব আনন্দিত হইলেন। হর্ষে কিছুকাল কথা কহিতে পারিলেন না। অনেক ক্ষণ পর বলিলেন:—"তবে কালই আমি কলিকাতায় যাইয়া উকিল বাবুর পারিতোষিকের টাকা দিয়া আসিব, এবং রায় ফয়সালার নকলাদিও লইব। কি জানি সে যদি আবার প্রিভি-কাউন্সিলে আপিল করে।"

অম।—তোমার আর কলিকাতা যাইতে হইবে না। উকিল বাবুকে আমিই পারিতোষিকের টাকা দিয়া আসিয়াছি এবং রায়

ফয়সালার নকলও লইয়া আসিয়াছি। উকীল বাবু বলিলেন যে, 'এই মোকদ্দমার আর বিলাত আপিল হইতে পারে না,—হাইকোর্টেই ইহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়াছে।'"

এই বলিয়া অমরেশচন্দ্র একটী কাগজের তাড়া বাহির করিয়া উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া কএকখানি মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজ বাহির করিয়া শৈলের হাতে দিলেন। শৈল অতি ব্যগ্রতা সহকারে উহা পাঠ করিতে লাগিলেন। যতই পড়েন, ততই মনে মনে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। মুখ ক্রমে প্রসন্ন হইতে লাগিল।





দশম পরিচ্ছেদ

আশা ফলবতী



যৌবন-প্রারম্ভের কল্পনা-লহরী শেষ হইবার নহে। চিন্তা মিথ্যাবাদিনী হয়, কিন্তু কল্পনা মায়াবিনী-রূপ ধারণ করিয়া আশার আশ্বাস বাক্যে সুন্দর ভবিষ্যতের পথে টানিয়া লইয়া যায়। তখন মনে হয়, আশা বিশ্বাসঘাতিনী হইবে না। কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে তখন মনে আসিয়া কত কথারই উদয় হয়।

মনোরমা শৈলকণ্ঠের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া লজ্জায় আপনার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ভিখারিণীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

মনোরমা অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া, তাহার পর ভিখারিণীর কাণে কাণে কি বলিয়া দিলেন। ভিখারিণী কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। মনোরমার মুখমণ্ডল এক কমনীয় শান্তভাব

ধারণ করিল। নূতন জ্যোতিতে যেন চক্ষুযুগল আলোকিত হইল। নূতন উল্লাসে সে লাবণ্যময় দেহখানি টলমল করিতে লাগিল।

সাবধান মনোরমা! তুমি বালিকা নহ, যুবতী; কুরূপা নহ, রূপবতী; মূর্খ নহ, শিক্ষিতা। তোমার চিন্তাশক্তি আছে। তরুণ বয়সে প্রণয়োল্লাসে সকলেই মোহিত হয়। ইহাকে যৌবনের মোহিনী শক্তি বলে।

রজনী ক্রমে বাড়িতে লাগিল,—একে একে সমস্ত কথা তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল। যখন মনে হইল, চিত্রটী ফেলিয়া আসিয়াছেন, তখন লজ্জায় আপনা-আপনি মাথা হেঁট করিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, সকলেই যেন সে চিত্র দেখিয়াছে। ছি! ছি! কি লজ্জার কথা! কেন আমি এ কার্য্য করিলাম? যদি চিত্রবিদ্যা না শিখিতাম তাহা হইলে ত আমায় আজ এ প্রকার বিপদগ্রস্ত ও অপদস্থ হইতে হইত না। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে মনোরমা যাইয়া শয়ন করিলেন। তন্দ্রা আসিয়া তাঁহার চক্ষুযুগল আবৃত করিল। তিনি বিশ্রাম-দায়িনী নিদ্রার কোমল কোল আশ্রয় করিলেন। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখিলেন, অমরেশচন্দ্র কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। তিনি মনোরমার জন্য কলিকাতার যত সুন্দর জিনিষ পাইয়াছেন, তাহার সমস্তই আনিয়াছেন। বাক্স ভরা ভরা গহনা, পোর্টমেণ্ট ভরা ভরা জামা ও কাপড়, পেটারি ভরা ভরা পুতুল, সুগন্ধি দ্রব্য, আতর, গোলাপ জল, মাথার ফিতা, কার, আয়না, চিরুণী,

আরও কত কি। কিন্তু কিছুই মনোরমা প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পারিতেছেন না। তিনি দেখিতেছেন, সব বাক্সের উপর ও মধ্যে, সব গহনার সঙ্গে, সব জামার উপর, সব কাপড়ের উপর, প্রত্যেক খেলনার সঙ্গে, প্রত্যেক জিনিষে সেই চিত্র। এ কি! একখানা চিত্র এত অসংখ্য হইল কেমন করিয়া? ভিখারিণী সেই সমস্ত দেখিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছে।

ভিখারিণী শৈলকণ্ঠের নিকট হইতে চলিয়া আসিবার সময় দেখিল, অমরেশচন্দ্র আসিয়া পৌছিলেন। তাড়াতাড়ি মাতাকে যাইয়া অমরেশচন্দ্রের আগমন-সংবাদ দিয়া, মনোরমার কক্ষে প্রবেশ করিল। যাইয়া দেখিল, মনোরমা নিদ্রিতা, কিন্তু তাহার সুন্দর অধরে লজ্জা-চিহ্ন। তাই দেখিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ভিখারিণীর হাসিতে মনোরমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। মনোরমা উঠিয়া বসিয়া ভিখারিণীকে দেখিবামাত্র বিস্ময়াপন্না হইলেন। ডাগর ডাগর চক্ষুদুটী কোমল অঙ্গুলি দ্বারায় আস্তে আস্তে পরিষ্কার করিয়া হাসিয়া কহিলেনঃ—"কি হইল? আশা ফলবতী?"

ভিখারিণী কহিলঃ—"তোমার সে কথায় কাজ কি?"

মনোরমা অপ্রতিভ হইলেন। ভিখারিণী তাঁহার লজ্জা দেখিয়া মুচকি মুচকি হাসিয়া কহিলঃ—"যার ধন সে পেয়েছে, আমায় দিবে কেন?"

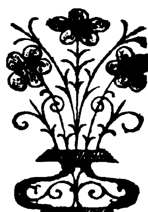
মনোরমার মুখ স্ফুটনোন্মুখ পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল হইল। ভিখারিণীর মুখপানে চাহিয়া কহিলেনঃ—"তবে তোমায় পাঠাইলাম কেন?"

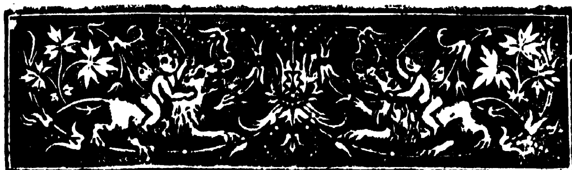
ভিখারিণী বলিল ঃ—"আমি তাঁহার সহিত দাদা সম্পর্ক পাতাইয়াছি। তিনি আমার দাদা, আমি তাঁহার ভগিনী। আমার শৈল দাদা তোমায় বিবাহ করিবেন। চিত্র আমি চাহিতে পারিলাম না।"

মনোরমার মুখ গম্ভীর হইল,—অধোবদনে পৃথিবী পানে চাহিয়া রহিলেন।

ভিখারিণী বলিল ঃ—"তোমার দাদা আসিয়াছেন।"

মনোরমা ছুটিলেন।





একাদশ পরিচ্ছেদ

মিলন।



এ ক মাস হইল অমরেশচন্দ্র শ্রীরামপুর ছাড়িয়া পৈত্রিক ভদ্রাসন চুঁচড়ায় আসিয়াছেন। দুষ্ট জ্ঞাতি এখন তাঁহার পদানত হইয়াছে। বাড়ী আসার দিন হইতেই আনন্দের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। দ্বারে নহবৎ বজিতেছে, নৃত্যগীতাদির হুলুস্থূল পড়িয়াছে। প্রত্যহ শত শত প্রজা আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেছে। অমরেশচন্দ্র তাঁহাদের আহারাদির সুশৃঙ্খলা করিয়া দিয়াছেন। সকলেই তাঁহার এই অভিনব কার্য্যপ্রণালীর প্রশংসা করিতেছেন। স্থানীয় লোকের আর আনন্দের পরিসীমা নাই। শক্র পক্ষ মিত্র পক্ষ সকলেই এখন আসিয়া মিত্র হইয়াছেন। স্থানান্তর হইতে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব আসিয়া আবাস-ভবন আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছেন।

আজ সকলের মনে আবার এক অভিনব উৎসাহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ হইতে অমরেশচন্দ্রের বাড়ীতে আরও আমোদের ঘটা অধিক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জয়ঢাকের হৃদয়োদ্দীপক বাজনা সকলের মনে আরও উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছে। গায়কগণ কোকিলকণ্ঠে পঞ্চমে চড়াইয়া গান করিতে করিতে শ্রোতাদিগকে মোহিত করিতেছে। হাল ফেশানি যুবকগণ নর্ত্তকীর নৃত্য ও সুগায়িকার গান দর্শন ও শ্রবণে আত্মবিহ্বল হইয়া হাসিতে হাসিতে নিশ্বাস ফেলিবার সময় পাইতেছে না। ছেলের দল সন্দেশ খাইবার লোভে দলে দলে আসিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইতেছে। মনোরমার মাতা তাহাদিগকে যথেষ্ট সন্দেশ ও মিষ্টান্ন বিতরণ করিতেছেন। কেহ খাইতেছে, কেহ নাচিতেছে, কেহ গাইতেছে, কেহ বা খাইতে না পারিয়া পুটুলি বাঁধিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেছে। মনোরমার মাতা এই আনন্দে মাতিয়াছেন। একটী দুই বৎসরের শিশুর হাতে তিনি একখানি আতাবি সন্দেশ দিয়াছিলেন, বালক সন্দেশ পাইয়া মনের আনন্দে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদ বিক্ষেপ করিয়া যখন হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যাইতেছিল,তখন হঠাৎ কাহার অঙ্গস্পর্শে সে পড়িয়া গেল। সন্দেশও হস্তস্খলিত হইল। একটী কাক আসিয়া সন্দেশটী লইয়া গেল। বালক ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল যে, সন্দেশ নাই। অমনি আবার ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। মনোরমার মাতার বালকের দিকে লক্ষ্য ছিল, তাই আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন :—"কেঁদনা বাবা! আমি তোমাকে অনেক সন্দেশ দিব।"

বালকের ক্রন্দন থামিল না, সে কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল ঃ—"আমি আর থন্‌দেশ তাই না, আমার ঐ থন্‌দেশই ভাল থিল।"

মনোরমার মাতা বালককে সন্দেশের ঘরে নিয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন ঃ—"তোমার যাহা খুসি তাহাই লও। কেঁদ না!"

বালক রাশীকৃত সন্দেশ দেখিয়া ক্রন্দন ভুলিয়া গেল। হাসিয়া একটী সন্দেশের ঝুড়ির ধারে যাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা তাহার কিনারা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া একদৃষ্টে মনোরমার মাতার প্রতি চাহিয়া রহিল

মনোরমার মাতা ভিখারিণীকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ—"এই ছেলেটীকে ঐ সন্দেশ সহকারে উহার বাড়ী দিয়া আইস।"

ভিখারিণী মাতার আজ্ঞা পালন করিতে চলিল। পথে যাইতে যাইতে বালক বলিল ঃ—"তুমি কার মা?"

"আমি কাহারও মা নহি।"

"আমার মা?"

"তোমার মা ঘরে।"

"ডিডি?"

"খেলিতেছে।"

"তোমার মা থন্‌দেশ।"

"আমার মা তোমাকে এই সন্দেশ দিয়াছেন।"

বালকের প্রাণে বড় আনন্দ হইল। হাত তুলিয়া আস্তে আস্তে নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল ঃ—"তোমার মা ভাল, আমাকে থন্‌দেশ দিয়াছে।"

"তোমার মা তোমাকে সন্দেশ দেন না?"

বালক কোন উত্তর করিল না।

ভিখারিণী শিশুটীকে লইয়া যাইতেছে; কিন্তু কোথায় লইয়া যাইবে তাহা ত জিজ্ঞাসা করিয়া আসে নাই? পথ দিয়া একটী বৃদ্ধা যাইতেছিলেন, ভিখারিণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল:— "হা গা মা! এই ছেলেটীর কোন্ বাড়ী?"

বৃদ্ধা ছেলেটীর মুখ পানে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিলেন। তাহার পর ভিখারিণীর মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া শেষে বলিলেন:— "তোমার নাম কি গা?"

ভিখারিণী বলিল:—"ভিখারিণী।"

বৃদ্ধা বলিলেন:—"তোমার ভিখারিণী নাম হইল কেন?"

বৃদ্ধার কথা যেন ভিখারিণীর কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল। তাই বলিল:—"হাগা মা! তুমি অত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

বৃদ্ধা ত অমন কথা কখন শুনেন নাই। তাহার কথা শুনিয়া আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া রাস্তার ধারে একখানা বাড়ীর রকে যাইয়া বসিলেন, এবং ভিখারিণীকেও তথায় বসিতে বলিলেন।

ভিখারিণী তাঁহার নিকটে বসিলে বৃদ্ধা বলিলেন:—"আমার মা! একটী মেয়ে ছিল। মেয়েটী যখন তিন বৎসরের তখন ছেলে-ধরায় তাহাকে নিয়া যায়। সে যদি আজ থাকিত তবে তোমার মত এত বড়টী হইত। যে দিন হইতে আমি আমার নয়নতারাকে

হারাইয়াছি সেই দিন হইতে আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া চারিদিকে ছুটাছুটী করিতেছি। কোথাও তাহাকে দেখিতে পাই না। আজ তোমার চাঁদপানা মুখখানি দেখিয়া আমার সেই মুখখানি মনে পড়িয়াছে।”

এই বলিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিলেন।

হরবল্লভ রায় অমরেশচন্দ্রের জ্ঞাতি। এই বৃদ্ধা অমরেশচন্দ্রের মাতার অনেক সহায়তা করিতেন। সেইজন্য হরবল্লভ বৃদ্ধার মেয়েটীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যান। বৃদ্ধা মেয়ে হারাইয়া পাগলের মত ছুটাছুটী করিতেন। হরবল্লভ ভিখারিণীকে চুরি করিয়া প্রথমে কলিকাতায় গিয়া তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে রাখেন। সেখানে ভিখারিণী প্রায় ৫ বৎসর ছিল। যখন ভিখারিণীর বয়স ৮ বৎসর তখন তাহাকে শ্রীরামপুরে আনিয়া এক বৈষ্ণবের বাড়ী রাখেন। সেইখানে থাকিয়া ক্রমে অমরেশচন্দ্রের মাতার সহিত তাহার পরিচয় হয়। হরবল্লভ ভিখারিণীকে চিনিতেন। ভিখারিণী হরবল্লভকে অনেকবার দেখিয়াছে, কিন্তু চিনিত না যে, এই হরবল্লভ।

যখন বৃদ্ধা ভিখারিণীর নিকট বসিয়া কাঁদিতেছিলেন তখন হরবল্লভ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। এ হরবল্লভ আর সে হরবল্লভ নহেন। যিনি একদিন বৃদ্ধার নয়নতারাকে কাড়িয়া নিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, সেই হরবল্লভ আজ হঠাৎ বৃদ্ধার নিকটে আসিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া বলিলেন ঃ—“আমায় আপনি ক্ষমা করুন?”

বৃদ্ধা হঠাৎ হরবল্লভকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন ঃ—“আমার গলা টিপে মারিয়া ফেল। মারিয়া ফেলিয়া তোমার

ছেলে নিয়ে ঘরে যাও, আমি তোমার ছেলেকে কিছু বলিব না। আমার যন্ত্রণার শেষ হউক।"

ভিখারিণী একদৃষ্টে হরবল্লভের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ছেলেটী বাবা বাবা বলিয়া যাইয়া হরবল্লভকে জড়াইয়া ধরিল। হরবল্লভ বাষ্পাকুল লোচনে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন :—"পিসি মা! ছেলেবেলায় তুমি আমাকে কত ভালবাসিতে, কত আদর করিতে, কত আব্দার সহিতে। আমার আজ সেই কথা মনে হইতেছে। আমি নরাধম, আমি ধনলোভে উন্মত্ত হইয়া কত গর্হিত কার্য্যই করিয়াছি, তাহার সীমা নাই। আজ আমাকে শত বৃশ্চিকে দংশন করিতেছে। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর, রক্ষা না কর তবে বোধ হয় নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু নিকট।" এই বলিয়া ভিখারিণীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন :—"দিদি ভিখারিণী! এই বৃদ্ধাই তোমার মাতা। তোমার নাম ভিখারিণী নহে, তোমারই নাম সরসীবালা।"

বৃদ্ধা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। ভিখারিণীকে টানিয়া আনিয়া আপন বক্ষে ধারণ করিলেন। আজ একাদশ বৎসর বৃদ্ধা সরসীবালাকে হারাইয়া পাগলিনী হইয়াছিলেন। এক মুহূর্ত্ত সেই নয়নতারাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া হৃদয় শীতল করিলেন। তাহার পর হরবল্লভের দিকে চাহিয়া বলিলেন :—"বাছা! তুমি যেমন আজ আমাকে শীতল করিলে, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমার সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তোমাকে সুবুদ্ধি প্রদান করেন।"

মনোরমার মাতা মুক্ত বাতায়নে দাঁড়াইয়া এই অভিনব দৃশ্য দেখিতেছিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। কৌতূহল নিবারণ জন্য সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যদি সেই স্থানে সেই সময়ে বজ্রপাত হইত তাহা হইলেও হরবল্লভ তত আশ্চর্য্য বোধ করিতেন না। কিন্তু মনোরমার মাতাকে সেই স্থানে আসিতে দেখিয়া নিশ্চল কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হইল।

মনোরমার মাতা বৃদ্ধাকে দেখিয়া চিনিলেন। অমরেশচন্দ্র সেই-ক্ষণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরবল্লভ পুত্রটীকে কোলে করিয়া অমরেশের মাতার পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন।

অমরেশচন্দ্রের মাতা শিশুটীকে আপন ক্রোড়ে উঠাইয়া নিয়া হরবল্লভের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন:—"ভগবান যাহা করেন, তাহা মঙ্গলের জন্যই। তোমার যে অনুতাপ আরম্ভ হইয়াছে, এইটীই তোমার মঙ্গলের কারণ। যখন ভিখারিণীর মাতা সুখী হইয়াছেন, তখন আমরা সকলেই সুখী।"

তাহার পর অমরেশচন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন:—"ইনি তোমার দাদা, ইহাকে প্রণাম কর। আর যাহাতে ইহার কোন কষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দাও। হরবল্লভ এতদিন রাজভোগ পাইয়াছেন, তাহার যেন অন্যথা না হয়।"

অমরেশচন্দ্র বলিলেন:—"আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

হরবল্লভ দৌড়িয়া বাড়ী যাইয়া, সস্ত্রীক আসিয়া, অমরেশচন্দ্রের বাটীতে উপস্থিত হইয়া আনন্দে যোগ দান করিলেন।

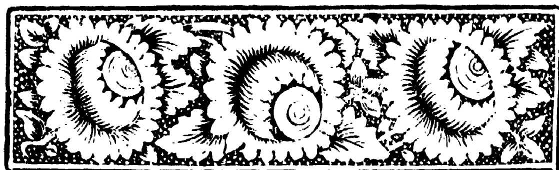
এই প্রকার আনন্দ-কোলাহলে দুই দিন কাটিয়া গেল। অদ্য তৃতীয় দিন। আজ শৈলকণ্ঠের সহিত মনোরমার পরিণয়কার্য্য সমাধা হইবে। তাহাদের মনে আজ আনন্দ কি বিষাদ, তাহা বিবাহিত ব্যতীত অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না। যাহারা কিছু বয়স্থ হইয়া বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, বিবাহের পূর্ব্ব সময়ে তাঁহারা কি প্রকার অধৈর্য্য হইয়াছিলেন। আজ শৈলকণ্ঠের মনও সেই প্রকার অধৈর্য্য হইয়াছে। মনে মনে ভাবিতেছেন,—"কতক্ষণে দিবাভাগ কাটিয়া যাইবে,—কতক্ষণে সেই সুখের সময় আসিয়া অধৈর্য্য প্রাণে ধৈর্য্য স্থাপন করিবে? যাঁহাকে এতদিন হইতে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী করিবার বাসনা ছিল, আজ তাঁহাকে পাইয়া জীবন চরিতার্থ করিব।" এই প্রকার চিন্তা ও আনন্দসলিলে ভাসিয়া ভাসিয়া যতই যান,—কেবল চারিদিকে অবিশ্রাম আনন্দ দেখিতে পান। শৈলকণ্ঠ এইরূপ চিন্তায় অনেক দূর যাইলেন। যাইতে যাইতে আর শেষ দেখিতে পাইলেন না, দেখিলেন, জগত প্রেমময়। তখন তাঁহার হৃদয়ে সুখের অবধি নাই। তাই বলিলেন:—"যদি শেষ থাকিত তবে আমি পাই না কেন?" এস্থানে গ্রন্থকার বলিবেন:—"আজ পাইতেছ না, ধৈর্য্য ধর, একদিন পাইবে। তখন সহস্র মনোরমারও মাধুরী-মিশ্রিত রূপের ছটা তোমার প্রাণ আকুল করিতে পারিবে না।"

বেলা অবসানে সূর্য্যদেব বিশ্রামার্থ অস্তাচলশায়ী হইয়াছেন। এখন আহারাদির গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে। গোধূলি লগ্নে বিবাহ, সময় প্রায় হইয়া আসিল। আত্মীয়, কুটুম্ব ও নিমন্ত্রিত

সকলেই অন্যান্য কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদন করিয়া এই শুভ বিবাহে যোগদান করিবার জন্য বিবাহ বাড়ীতে আসিতে লাগিলেন। সকলেই সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া, গোঁপে আতর, রুমালে ও মাথায় নানারূপ সৌগন্ধ পুষ্পসার মাখিয়া, মাথায় টেরি কাটিয়া, আতর গোলাপের ফরা উড়াইয়া, বৈঠকখানায় যাইয়া বসিয়া খোস গল্প আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সময় উপস্থিত হইল, — বর সভাস্থই ছিলেন, তাঁহাকে লইয়া সকলেই ছায়ামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে অন্দরমহলে কাণ পাতা যায় না। পুরোহিত ঠাকুর উচ্চরবে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। স্বয়ং অমরেশ-চন্দ্র সম্প্রদানকার্য্য শেষ করিলেন। শুভদৃষ্টি হইয়া গেল। সেই সময়ে সমস্বরে অন্তরাল হইতে কোকিলকণ্ঠে সঙ্গীত হইতে লাগিল ঃ—

"গাও সবে আজ সুমধুর তানে
প্রণয়-পীযূষ মধুর গান।
মাতুক প্রণয়ে প্রণয়ী দুজনে
জুড়াক্ হেরিয়া মোদের প্রাণ।
কর আরাধনা তাঁহার সদনে,
তিনি হে পালক অখিল ভুবনে,—
তাঁর আশীর্ব্বাদে এদের জীবনে
সম ভাবে প্রেম বহে গো যেন।"

সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া এক মনে গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর নব দম্পতি বাসর ঘরে প্রবেশ করিলেন। এ দিকে নিমন্ত্রিতদিগের আহারের ধূম পড়িয়া গেল।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সমাপ্তি।



নোরমা পরদিন স্বামীর সঙ্গে বজরায় চাপিয়া শ্বশুর-বাড়ী চলিলেন। স্বামীর সঙ্গে যাওয়া যদিও সুখ তবুও তাঁহার প্রাণ মায়ের জন্য ব্যাকুল হইল। অনবরত কাঁদিতে লাগিলেন। মাতা নানাবিধ মধুর বাক্য বলিয়া মনোরমাকে সান্ত্বনা করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ক্রন্দন থামাইতে পারিলেন না। মনোরমা একদিন কাঁদিয়াছিলেন,—মাতা মরিবেন ভাবিয়া;—আজ কাঁদিতেছেন,—সেই মাতাকে ফেলিয়া যাইতেছেন বলিয়া। কালের গতি এ রকমই বটে।

মনোরমার মাতা বলিলেন:—"মা মনোরমে! ফুল যতক্ষণ বৃক্ষে ফুটিয়া থাকে ততক্ষণই সুন্দর। তুমি তোমার কল্পবৃক্ষ স্বামীর সঙ্গে যাইতেছ, তোমাকে আজ কত সুন্দর দেখাইতেছে।

হাসিয়া হাসিয়া স্বামীর সঙ্গে যাও। ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন। আমিও দেখিয়া সুখী হইব। কাঁদিয়া যদি চলিয়া যাও তবে তোমার জলভরা চক্ষুদুটী সর্ব্বদা আমার নয়নে বিরাজ করিয়া আমাকে অসুখী রাখিবে।”

মায়ের কথায় মনোরমা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, নিদাঘের কাল মেঘের কোলের বিজ্‌লীবৎ সলজ্জভাবে একটু হাসিয়া, ধীরে ধীরে মাতাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

শৈলকণ্ঠের অনুরোধে ভিখারিণীও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন।

শৈলকণ্ঠ বাড়ী পৌঁছিলেই তাঁহার ভগিনী অনুপমা আসিয়া শৈলকণ্ঠের গলা ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। এ কান্না দুঃখের নহে—সুখের। শৈলকণ্ঠ অনুপমার হস্তে মনোরমাকে সমর্পণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। অনুপমা মনোরমার ঘোমটা খুলিয়া দিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। ভিখারিণী হাসিয়া বলিল:—“কি দেখিতেছ বোন?”

অনুপমা হাসিয়া বলিলেন:—“দাদা আমার বৌদিদির কমনীয় গঠন ও চাঁদপানা মুখখানি দেখিয়াই ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি দেখিতেছি, আমার বৌদিদি বোবা।”

মনোরমার একটু লজ্জা বোধ হইল। আস্তে আস্তে মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন:—“না ভাই! তোমার অনুমান মিথ্যা।”

গৃহ মধ্যে হাসির গোল বাঁধিয়া গেল।

গ্রামের স্ত্রীলোকেরা আসিয়া সকলেই বৌ দেখিয়া গেল। সকলেই বৌয়ের প্রশংসা করিতে লাগিল। বৌভাতের দিন স্ত্রী পুরুষ সকলেই উদর পরিতোষ করিয়া ভোজন করিল।

বিবাহের কয়েক দিন পর শৈলকণ্ঠ ও মনোরমাকে দেশ-প্রচলিত নিয়ম অনুসারে আপন বাড়ী আনার জন্য, অমরেশচন্দ্র তাঁহাদের বাড়ী আসিলেন। শৈলকণ্ঠের মনে অপার আনন্দ। তাঁহার মাতা ও অনুপমা তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিলেন।

একদিন অমরেশচন্দ্র মনোরমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। মনোরমা কি কার্য্য উপলক্ষে গৃহান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। অনুপমা মুক্ত বাতায়নে বসিয়া আপন মনে গাহিতেছিলেন। সন্ধ্যা-সমীরণ পার্শ্বস্থিত উদ্যানপ্রস্ফুটিত ফুলগুলির সহিত খেলা করিয়া, বাতায়ন পথে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কেশগুচ্ছ দোলাইতেছিল। তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতেছিলেন :—

"নির্ম্মল তারকারাজি ফুটেছে গগনে।
সুন্দর মলয়ানিল বহিছে সঘনে॥"

অমরেশচন্দ্র একটু আমুদে, অনুপমাও কম নহেন, কিন্তু সরলা। অমরেশচন্দ্র আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন :—"কবি ঠাকুর! প্রাতঃ প্রণাম। বলি যখন এত ভাব, তখন একা থাকা ভাল নয়,—দো ছোট লও।"

অনুপমা অমরেশচন্দ্রকে দেখিয়া লজ্জায় একটু নতমুখী হইয়া বলিলেন :—"গরীব মানুষ,—দো ছোট কোথা পাব? তাতে আবার স্ত্রীলোক।"

অমরেশচন্দ্র বলিলেন ঃ—"তোমার দাদাকে বলিয়া একটা আনাইয়া দিব।"

অনুপমা দেওয়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অমরেশ-চন্দ্রকে একখানা ছবি দেখাইয়া বলিলেন ঃ—"আমি ত মনোরমা নহি।" সেই সময়ে মনোরমা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মনোরমা এক্ষণে শ্বশুর বাড়ী, অতএব শ্বশুর বাড়ীর চির মর্য্যাদা অনুসারে অর্দ্ধ ঘোমটা দিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন ঃ—"আমি বাড়ী যাইবার জন্য সমস্ত উদ্‌যোগ করিয়া রাখিয়াছি।" মনো-রমার কথা শেষ হইতে না হইতেই অনুপমা জানালা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার অর্দ্ধ-ঘোমটা ফেলিয়া দিলেন। মনোরমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সেই সময়ে বাহির হইতে শৈল অমরেশ-চন্দ্রকে ডাকিলেন। অমরেশ বাহিরে আসিয়া শৈলকণ্ঠ ও তাঁহার মাতাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের ভাবে বোধ হইল যে, কোন একটী গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছেন।

এই ঘটনার তিন মাস পর শৈলকণ্ঠের বাটীতে মহা সমারোহে অনুপমার বিবাহ হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, এ বিবাহের বর,—স্বয়ং অমরেশচন্দ্র।

ভিখারিণীকে বিবাহ দিবার জন্য সকলেই অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ভিখারিণী তাহাতে কর্ণপাত করিল না। যখনই তাহাকে বিবাহের কথা বলা হইত তখনই সে বলিত ঃ—"একজনের দাসী হইলে ত আর স্বাধীনভাবে গান গাহিয়া বেড়া-

ইতে পারিব না। আমি সঙ্গীতরাজকে বিবাহ করিয়াছি। আমাকে আর আপনারা অন্য বিবাহের জন্য অনুরোধ করিবেন না।”

ভিখারিণী গান গাহিয়াই সুখী হইত। কখন বা শ্রীরামপুরে যাইয়া সেই বৈষ্ণবের বাড়ী থাকিত। কখন বা চুঁচড়ায় আসিয়া অনুপমার নিকটে থাকিত। আবার কখন বা মনোরমাকে দেখিবার জন্য ভবানীপুর যাইত। যেখানেই যাইত বৃদ্ধা মাতাকে সঙ্গ ছাড়া করিত না।

অমরেশচন্দ্র মাঝে মাঝে অনুপমাকে বলিতেন ঃ—

“দো- ছোট লও।”

এখন ত আর মনোরমা নিকটে নাই যে অনুপমা তাঁহার ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া শোধ নিবেন। সেইজন্য বিলোল কটাক্ষে অমরেশচন্দ্রের পানে চাহিয়া ছুটিয়া পলাইয়া যাইতেন।